জলধর সেনের আত্মজীবনী

লিপিকার

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

*

পবিশিষ্টে

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

লিখিত 'জলধব সেন'

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ভূমিকা

"জলধর সেনের আত্মজীবনী" ১৩৫১ সালের বৈশাখ মাসে "প্রবর্ত্তক" মাসিক পত্রিকায় যখন প্রথম বাহির হইতে আরম্ভ হয়, তখন নিবেদনে বলিয়াছিলাম :

"বিশ বৎসর পূর্ব্বে, পরলোকগত সাহিত্যসাধক রায় জলধর সেন বাহাদুরের—আমাদের সকলের অতিপ্রিয় শ্রদ্ধেয় 'দাদা'র, ৬৫তম জন্মদিনে 'কলিকাতা হোটেলে' একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করা হইয়াছিল। দাদার সবিশেষ অনুরাগী কয়েকজন সাহিত্যিকবন্ধু তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। সেইদিন দাদাকে অনুরোধ জানাই যে, তাঁহার জীবন-কথা তাঁহারই মুখ হইতে শুনিয়া আমি লিপিবদ্ধ করিব। দাদা তখন কোন উত্তর প্রদান করেন নাই—একটু হাসিয়াছিলেন মাত্র। তাহার পর কয়েক দিন ধরিয়া বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইতে, তিনি শেষে স্বীকৃত হ'ন। কিন্তু বলেন যে, যাহা লিপিবদ্ধ করা হইবে, তাহা তাঁহার জীবনকালে প্রকাশিত হইতে পারিবে না। আমি তাহাতেই সম্মত হই এবং ইংরাজী ৯।১।২৩ তারিখে তাঁহার জীবন-কথা প্রথম লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করি।

নানা বিষয়-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় এবং দুই জনে নিশ্চিন্তে বসিবার সেরূপ সুযোগ না ঘটায়, লেখা আদৌ নিয়মিত ভাবে অগ্রসর হয় নাই। ১৯২৯ এর শেষ পর্য্যন্ত ২১ দিন মাত্র লেখার জন্য উভয়ে মিলিত হইতে পারিয়াছিলাম। তাহার পর সাড়ে তিন বৎসর উহা একেবারে বন্ধ যায়। ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে আবার পাঁচ দিন লিখিতে সমর্থ হই।

শেষ জীবনে 'দাদা' ক্রমশঃ অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও, চিকিৎসকের ব্যবস্থানুযায়ী প্রতিসন্ধ্যায় ট্রামে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন এবং কালীঘাট—মনোহরপুকুরে যাইয়া কিছুক্ষণ তাঁহার পরম স্নেহাস্পদ এবং আমার একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ শ্রীযুক্ত গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসায় বিশ্রাম লইতেন। সেই সময়ে গৌরীবাবু আমার অনুরোধে আরব্ধ কার্য্যের বাকিটুকু সমাধা কবিবার ভার গ্র[illegible] কবেন। আমরা দাদার বাল্যের, কৈশোরের এবং প্রথম যৌবনেব ক[illegible] তাঁহার বিবৃতিমত যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং তিনি তাহা প[illegible] করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমাব প্রথম জীবনের কথাই তোমাদের ব[illegible] গেলাম। পরবর্ত্তী জীবনের কথা অনেক বন্ধুবান্ধবই ভাল করে জানে[illegible] তাঁদেব কাছ থেকে সে সব সংগ্রহ করা তোমাব পক্ষে কষ্টকর হবে না

পাঁচ বৎসর অতীত হইল, সর্ব্বজনপ্রিয় শ্রদ্ধেয় জলধর [illegible] পরলোকগত হইয়াছেন। এখন আর তাঁহার জীবন-কথা প্রক[illegible] বাধা নাই। 'প্রবর্ত্তক' কর্ত্তৃপক্ষেব বিশেষ আগ্রহে সাহিত্যসা[illegible] জলধর সেনের প্রথম জীবনের কথা সানন্দে তাঁহাদের সুপ্র[illegible] পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রদান কবিলাম।"

ক্রমশঃপ্রকাশ্য "জলধর সেনেব আত্মজীবনী" ১৩৫২ সালের চৈত্র মা[illegible] 'প্রবর্ত্তকে' শেষ হয়। তখনই 'প্রবর্ত্তক পাব্লিশার্স' ইহাকে পুস্তকাকা[illegible] প্রকাশ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ কবেন এবং আমি সানন্দে সম্মতি দান করি। কিন্তু নানা কারণে সুদীর্ঘ দশ বৎসর কা[illegible] কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হয় নাই। সম্প্রতি 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকা সম্পাদক ও পাব্লিশিং বিভাগের অধ্যক্ষ প্রীতিভাজন বন্ধু শ্রীরাধারমণ চৌধুরীর প্রচেষ্টায় পুস্তকখানি বাহির হইল, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ রহিলাম।

সুসাহিত্যিক, সাংবাদিকপ্রবর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় আমার বিশেষ অনুরোধে, 'জলধর সেন' শীর্ষক একটি তথ্যপূর্ণ ও মূল্যবান প্রবন্ধ দিয়া আমাকে ঋণী ও পুস্তকের গৌরব-বর্দ্ধন করিয়াছেন। জীবনে তাঁহার এই ঋণ পরিশোধের সাধ্য আমার নাই।

স্নেহভাজন বন্ধু শিল্পী শ্রীকাঞ্চন মুখোপাধ্যায় পুরাতন ফটো হইতে অতি যত্ন লইয়া পুস্তকের ব্লক কয়খানি করিয়া দিযাছেন। সেজন্য তাঁহাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

'দাদা'র আত্মজীবনীর সঙ্গে পরিশিষ্টে (১) তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা, (২) তাঁহার সংবর্দ্ধনার বিবরণ এবং (৩) শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিত 'জলধর সেন' প্রবন্ধ যোগ করিয়া দিলাম। প্রথমটি 'দাদা'র বৈবাহিক পণ্ডিত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এবং দ্বিতীয়টি "কায়স্থ-পত্রিকা" সম্পাদক মহাশয়েব অনুরোধে লিখিয়া দিয়াছিলাম। ভবিষ্যতে যদি কেহ সাহিত্যসাধক জলধর সেনের একটি সম্পূর্ণ জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনি বর্ত্তমান পুস্তক, কবি ব্রজমোহন দাস সম্পাদিত "জলধব কথা", বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত 'জলধর সেনের জীবনী' এবং 'দাদা'র নিজের লিখিত ও সম্পাদিত "ভারতবর্ষ" পত্রিকায়, ১৩৪২ কার্ত্তিক হইতে ১৩৪৩ জ্যৈষ্ঠ [illegible]স্ত প্রকাশিত ৮ জন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির স্মৃতি-তর্পণ—লেখাগুলির ভিতর হইতে তাঁহার জীবনী রচনার উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

পরিশেষে আমার নিবেদন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত 'দাদা'র সম্বর্দ্ধনা [illegible] বৈশাখ ১৩৪২) বিষয়টি পরিশিষ্টে বাদ পড়িয়া গিয়াছে, [illegible] আমি দুঃখিত। 'দাদা'র শেষ বয়সে প্রায় ১৫ বৎসরকাল ধরিয়া আমি তাঁহার নিত্যসঙ্গী ছিলাম, এজন্য নিজেকে বিশেষ ভাগ্যবান

মনে করি। বর্ত্তমানে রোগে এবং শোকে দুর্ব্বল দেহ ও মন লইয়া আমি "জলধর সেনের আত্মজীবনী" পুস্তকের প্রুফ ভাল করিয়া দেখিয়া উঠিতে পারি নাই, সেজন্য পুস্তক মধ্যে কিছু ভুল রহিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। যাহা হউক, সর্ব্বজনপ্রিয় জলধরদাদার এই আত্মজীবনী দেশবাসীর নিকট সমাদৃত হইবে, ইহাই আশা করি।

৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা-৯

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু
১লা বৈশাখ ১৩৬৩

সূচী
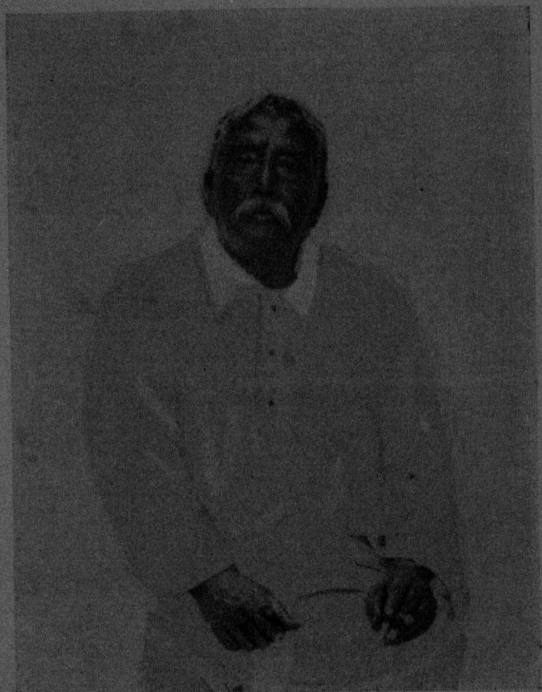
সাহিত্যরথী
রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর
(৬৫ বৎসর বয়সে)

জলধর সেনের আত্মজীবনী

[আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না নরেন, কেন তোমার এ দুর্ম্মতি হ'ল। জীবনকাহিনী তাঁহাদেরই লিখতে হয়, যাঁরা জন্মগ্রহণ করে' দেশের ও দশের অনেক কাজ করে' গিয়েছেন, যাঁদের জন্মগ্রহণে দেশের মুখ, বংশের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। আমার জীবনকাহিনীতে এ সকলের কিছু পাবার মোটেই সম্ভাবনা নেই। সত্যিই বল্‌ছি, বিনয়ের কথা নয়, মোটে কিছু নেই। তবে একটি কথা আছে, আমার জীবন ঘটনাবহুল। আমার জীবনে ঘোরতর দারিদ্র্যের সহিত বিপুল সংগ্রাম; আমার জীবনের আদ্যোপান্ত দুঃখের কাহিনী; তাই যদি শুনবার ইচ্ছা হয়ে থাকে তোমার, তা'হলে শুনতে পার, লিখে নিতে পার। আমার মনে হয়, তাতে হয়ত তোমার একটু উপকার হতে পারে, আর হয়ত জগতে আমারই মত হতভাগ্য দীন দরিদ্র যারা, তাদের কাছ থেকে সমবেদনা লাভ করা যেতে পারে।

শিক্ষার কথা বল্‌ছ—আমার জীবনকাহিনীতে শিক্ষালাভের কোন কথা নেই, তা' যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ করে'ও আমি বল্‌তে পারি না। সেটা এই যে, দরিদ্রের জীবন সংগ্রামের কাহিনী শুনে আমারই মত দরিদ্র কেউ কিঞ্চিৎ আশা ভরসা পেতে পারে। হয়ত, তারাও মনে করতে পারে, দারিদ্র্য ঘৃণার কথা নয়, দারিদ্র্যেরও একটা গৌরব আছে। এই পর্য্যন্তই ভূমিকা, এখন জীবন কথা আরম্ভ করি]

১২৬৬ সালের ১লা চৈত্র, (ইং ১৩ই মার্চ্চ ১৮৬০) মঙ্গলবার আমার জন্মদিন। আমি পিতামাতার প্রথম পুত্র, প্রথম সন্তান নই। আমার পূর্ব্বে দুটী ভগ্নী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বড়দিদি অনেকদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁর পরের মেয়েটি ছ-মাসের হয়ে মারা যায়। তার পরেই আমার জন্ম। আমার কথা বলবার আগে আমার বংশ পরিচয় একটু দি।

আমাদের বাড়ী নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালী গ্রামে। আমি যখন জন্মাই, তখন আমাদের গ্রাম নদীয়া জেলার মধ্যে ছিল না, পাবনা জেলায় ছিল। আমার বয়স যখন আট কি নয় বৎসর, তখন নূতন ক'রে জেলা গঠন হয়, সেই থেকে আমাদের গ্রাম নদীয়া জেলাভুক্ত হয়। আমার বেশ মনে আছে—আমার মেজদাদা পাবনায় ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন। আর তার কিছুদিন পরে আমার বড়দাদা কৃষ্ণনগরে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে গিযেছিলেন।

আমার পিতামহের নাম ৺গদাধর সেন। আমরা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ। আমার প্রপিতামহ কুমারখালির ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশম-কুঠীর দেওয়ানীর কাজ পেযে কুমারখালিতে গিয়েছিলেন। সেই থেকেই তাঁরা সেখানকার স্থায়ী অধিবাসী হয়ে পড়েন। তাঁদের আদি নিবাস ছিল চব্বিশ-পরগণাব বারাসতের নিকট দেগঙ্গ গ্রামে। তাই আমরা এখনও পরিচয় দি, আমরা দেগঙ্গের সেন, আমরা অনন্তের সন্তান। দেগঙ্গে বা অন্য কোন স্থানে আমাদের জ্ঞাতি কেহ আছেন কি না, তা' আমি মোটেই জানতাম না। অল্পদিন হ'ল কথা-প্রসঙ্গে জানতে পারলাম যে, প্রসিদ্ধ শিল্পী, আমার সোদরোপম শ্রীমান্ যতীন্দ্রকুমার সেন আমাদেরই জ্ঞাতি। এমন জ্ঞাতি হয়ত অনেক স্থলে আরও আছেন, সে খোঁজ আমি রাখিনি।

আমার পিতামহের দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র

স্বর্গীয় রামতনু সেন, তিনি আমার জ্যেঠামহাশয়। আর কনিষ্ঠ পুত্র হলধর সেন, তিনিই আমার পিতৃদেব। আমার পিতামহ তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় ক'রে সত্য সত্যই একেবারে ফকির হয়ে পড়েছিলেন। আমার জ্যেঠামহাশয়ের কাছে শুনেছি, সেই শ্রাদ্ধের নাম দ্বিজদম্পতী শ্রাদ্ধ। তাতে বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি ত করতেই হয়েছিল, তা' ছাড়া এক ব্রাহ্মণকুমার ও এক ব্রাহ্মণকুমারী এনে বিবাহ দিয়ে, ভূসম্পত্তি দান ক'রে তাদের সংসারে প্রতিষ্ঠা ক'রে দিতে হয়েছিল। এই শ্রাদ্ধেই আমার পিতামহ একেবারে কপর্দ্দকহীন হয়ে পড়েন। তাঁর যা' কিছু ধনসম্পত্তি ছিল, সমস্তই তিনি এই শ্রাদ্ধে ব্যয় ক'রে ফেলেছিলেন। সেই থেকেই আমাদের এই দারিদ্র্যের সূত্রপাত।

পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন উপায় না দেখে, আমার জ্যেঠা-মহাশয় রাজসাহী জেলার গালিমপুরের ওয়াটসন কোম্পানীর রেশমের কি নীলের কুঠীর গোমস্তাগিরি চাকুরী নিয়ে চলে যান। সেই চাকুরী তিনি অনেকদিন করেছিলেন। আমার পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গালিমপুর থেকে ফিরে এসে, আর তিনি চাকুরীতে যান নি।

আমার পিতা সামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখে এবং হিসাবকিতাবে দুরস্ত হয়ে, আমাদেরই গ্রামের রামমোহন প্রামাণিকের কাপড়ের দোকানে সামান্য চাকুরীতে প্রবেশ করেন। প্রথম প্রথম তাঁর কাজ ছিল, দোকানে যারা কাপড় কিনতে আসত, তাদের তামাক সেজে দেওয়া আর দোকানে গোমস্তার ফরমায়েস মত তাকের উপর থেকে কাপড় নামিয়ে দেওয়া। তখন তিনি মাসে বেতন পেতেন দেড় টাকা, আর প্রত্যহ এক পয়সার জলখাবার। সকালে উঠে' হাত-মুখ ধুয়ে তিনি দোকানে যেতেন, ১১৷৷০—১২টায় বাড়ী ফিরতেন, তারপর আহারাদি শেষ করে' দুটার সময়ে দোকানে যেতেন, ফিরতে

রাত্রি ৮।৯টা বেজে যেত। কখন কখনও ১০টা হ'ত। পূজার সময়ে বেচাকেনার ধূম পড়ে' গেলে, সারা রাত্রি দোকানে থাকতে হ'ত।

এই ভাবে কিছুদিন যাবার পর দেশে বিলাতী কাপড়ের আমদানী সুরু হ'ল। এর পূর্ব্বে আমাদের দেশের কাপড়ের দোকানগুলিতে মোটেই বিলাতী কাপড় বিক্রী হ'ত না। বাবা যে দোকানে কাজ করতেন, সেই দোকানের মালিক রামমোহন প্রামাণিক মহাশয় যখন শুনতে পেলেন যে, কলকাতার বাজারে বিলাতী কাপড় আমদানী হচ্ছে, তা' সস্তা, তখন তিনি বিলাতী কাপড় আমদানী করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু সে সময় রেল হয় নি, আমাদের দেশ থেকে কলকাতায় যেতে হ'লে নৌকায় যেতে হয়, আর সেও একদিন দু'দিনের পথ নয়। আমাদের গ্রাম থেকে কলকাতায় পৌছতে গেলে তখন ১৪।১৫ দিন সময় লাগত, আর পথেও নানা বিপদের সম্ভাবনা ছিল। শুধু সম্ভাবনা কেন, অতি কম নৌকাযাত্রীই চোরডাকাতের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ ক'রে যেতে পারতেন। রাণাঘাটের বিশ্বনাথ-বাবু প্রসিদ্ধ ডাকাত ছিল। তার দলের ডাকনাম ছিল বিশে ডাকাতের দল। বিশে বাগ্দীর দক্ষিণহস্ত ছিল বস্তিনাথ। তাদের এমন দুর্দ্দান্ত প্রতাপ ছিল যে, রাণাঘাটের চুর্ণীনদীর ভিতর দিয়ে যেতে অনেকেরই সর্ব্বনাশ হয়েছে। এই ভয়ে তখনকার দিনে আমাদের গ্রাম থেকে কলকাতায় যেতে কেউ বড় একটা সাহস করতেন না।

তখন আমাদের গাঁয়ের লোক মোটেই কলকাতায় ছিল না, এমন নয়। তারও একটু ইতিহাস আছে। আমাদের গ্রামটিতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং অন্যান্য জাত অনেক থাকলেও, সংখ্যায় বেশী ছিল এবং এখনও আছে তিলিজাতি। এঁদের সবায়েরই ধান-চালের কারবার ছিল—এখন যদিও অনেকে জমিদার হয়েছেন, বড় বড় চাকুরে

হয়েছেন, ডাক্তার হয়েছেন। আগে কিন্তু আমাদের গাঁয়ের এই জাতের কেউ অপরের চাকুরী করত না। যাকে নিতান্তই চাকুরী করতে হ'ত, সে স্বজাতীয় কারও আড়তে বা মোকামে চাকুরী করত। এই তিলি মহাশয়দের ধানচালের মোকাম ছিল রাজসাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি জেলায়। এসব জেলায় যে চাল হ'ত এবং এখনও হয়, তার নাম মুগীচাল। কলকাতার হাটখোলা, কুমারটুলীতে এই মুগীচালের অনেক আড়ত ছিল। যাঁরা ধনী মহাজন, তাঁরা কখনও কলকাতায় আসতেন না। চোর-ডাকাত এবং পথের কষ্টের জন্য তাঁরা কর্ম্মচারীদের উপরই কলকাতার আড়তের ভার দিয়ে রাখতেন। কলকাতার এই সব আড়তে আসল ধনীর নাম প্রচারই হ'ত না। যিনি প্রধান কর্ম্মচারী বা গদীয়ান থাকতেন, তারই নাম চলত, তাঁদেরই মান-সম্ভ্রম-পশার প্রতিপত্তি হ'ত। আমাদের গ্রামের যে কয়টা আড়ত সে সময়ে কলকাতায় ছিল, সেগুলির গদীয়ান আমাদেরই গ্রামেরই লোক ছিলেন। তাঁরা গোড়ায় রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি স্থানের মোকামে কাজ করে' প্রবাসী হতে অভ্যস্ত হয়ে, তবে কলকাতায় আসতেন। তাঁরা প্রায়ই ২।৪।৫ বছর অন্তর দেশে আসতেন।

আমার পিতার মনিব রামমোহন প্রামাণিক মহাশয়ের মাথায় যখন বিলাতী কাপড়ের ব্যবসার খেয়াল ঢুকল, তখন তিনি প্রথমে মনে করেছিলেন, কলকাতায় যে সব গদীয়ান আছেন, তাঁদেরই মারফতে কাপড় আনাবেন। কিন্তু শেষে ভেবে দেখলেন যে, তা' হলে ব্যবসার সুবিধা হবে না। কারণ এ সকল গদীয়ানের একটা অখ্যাতি ছিল। তাঁরা মনিবের লাভ যে দেখাতেন না তা' নয়, কিন্তু নিজের লাভ ষোল আনা দেখতেন। তাই অনেকেই ৫।৭ বছর গদীয়ানী করে' ২০।২৫ হাজারের মালিক হয়ে বসতেন। কি করে' যে এ ব্যাপার হত,

তা' খুলে না লেখাই ভাল। রামমোহন প্রামাণিক মহাশয় পাকা ব্যবসাদার ছিলেন। তিনি শেষে স্থির করলেন যে, নিজেদের লোক পাঠিয়ে, তাকে কলকাতায় রেখে বিলাতী কাপড়ের কারবার আরম্ভ করবেন। কিন্তু এই বিপদসঙ্কুল পথে জীবন হাতে করে' কলকাতায় আসতে কেউ রাজি হয় না। আমার বাবা পাঠশালায় লেখাপড়া শিখলেও, কায়েতের ছেলে ত বটে; শরীরেও তাঁর অসাধারণ শক্তি ছিল, বিপদ্‌-আপদও তিনি বড় একটা গ্রাহ্য করতেন না। তিনি তাঁর মনিবকে বললেন, "আপনি যদি আমাকে উপযুক্ত মনে করেন, আমি কলকাতায় যেতে রাজি আছি।" প্রামাণিক মহাশয় প্রথম একটু ইতস্ততঃ করেছিলেন; কায়েতের ছেলে ব্যবসা বোঝে না, তারা কেরাণীগিরি, গোমস্তাগিরির উপযুক্ত, জমাখরচই তারা লিখতে পারে। তাই আমার বাবাকে পাঠাতে প্রথমতঃ ইতস্ততঃ বোধ হয়েছিল। শেষে আর লোক না পেয়ে তিনি বাবাকেই কলকাতা পাঠান স্থির করলেন। বেতন স্থির হ'ল ১৮১৲ টাকা বছরে। তা' ছাড়া যাতায়াতের খরচ পাবেন, আর কলকাতায় যা বাসাখরচ লাগবে, তা' সরকার থেকে দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থা যখন ঠিক হয়ে গেল, তখন আমার জেঠাইমার মুখে শুনেছি, আমাদের বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে' গেল। বাড়ীর কর্ত্তা জেঠামহাশয় তখন বিদেশে—গালিমপুরে। বাড়ীতে বাবার ওপর কথা বলার লোক কেউ ছিল না। আমার মা, জেঠাইমা বা পিসীমা, এঁদের কারও এমন সাহস ছিল না যে বাবাকে নিষেধ করেন। কাজেই বাবা যা' স্থির করলেন, তাই হ'ল। শুনেছি, বাবার কলিকাতা যাত্রাব দিন স্থির হ'লে, তার পূর্ব্বের ক'দিন তিনি আর বাড়ীতে খেতে পান নি। আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে বিদায়ভোজ খেয়ে বেড়াতে হয়েছিল। তারপর তাঁর যাত্রার দিন যেদিন উপস্থিত হ'ল, সেদিন

সকলকে চোখের জলে ভাসিয়ে তিনি কলিকাতায় যাত্রা করলেন।

বাবার ভ্রমণকাহিনী পারি ত আর এক সময়ে সুবিধা মত ব'লব। এখন আমাদের বাড়ীর আর সকলের পরিচয় দি। আমার বাবার এক ভগিনী ছিলেন, তাঁর বিবাহ হয়েছিল যশোর জেলার বহির্গাছি। তিনি দুটী ছেলে নিয়ে যখন বিধবা হলেন, তখন আমার জেঠা-মহাশয় তাঁকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। তার পরে পিসীমা আর কখনও শ্বশুরবাড়ী যান নি, জীবনান্ত পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীর কর্ত্রী হয়ে বাস করেছিলেন। তাঁর দুটী ছেলের নাম বঙ্কুবিহারী ব্রহ্ম ও রাসবিহারী ব্রহ্ম। তাঁরাই আমাদের বড় দুই ভাই। তারপরে আমার জেঠামহাশয়ের দুই ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়েটী সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠা ছিলেন, তিনি আমাদের বড়দিদি, তাঁর নাম ছিল মুক্তাসুন্দরী। তিনি আমার মায়েরও বড়। জেঠ্‌তুত ভাই দুটীর নাম দ্বারকানাথ সেন ও কৃষ্ণনাথ সেন। পিসতুত ভায়েরা আমাদের একান্নভুক্ত হলেও এবং সকলের বড় হলেও, দ্বারকানাথই আমাদের বড়দাদা, আর কৃষ্ণনাথই আমাদের মেজদাদা। কাজেই আমি বাড়ীর সেজবাবু। আমার ছোট আর একটী ভাই ছিল, তাঁর নাম শশধর সেন। এই ছয় ভাই নিয়ে আমাদের সংসার। আমারও একটী বড়দিদি ছিলেন, তাঁর নাম সুসারসুন্দরী।

এইবার আমার কথা সুরু করি। যেদিন আমার জন্ম হয়, শুনেছি, সেদিন ঘটনাক্রমে বাবা ও জেঠামশায় দুজনেই বাড়ীতে ছিলেন। বাবার তখন খুব প্রসারপ্রতিপত্তি। পূর্ব্বেই বলেছি, ১৮১৲ টাকা বার্ষিক বেতনে তিনি কলকাতায় গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উপার্জ্জন খুব হ'ত; শুনেছি, নানা রকমে তিনি বছরে ২।৩ হাজার

টাকা রোজকার করতেন। নানা রকমটা গোপনের কিছুই প্রয়োজন নেই। সে সময়ে আর সকলে যেমন ক'রে উপার্জ্জন করতেন, তিনিও তাই করেছিলেন, সদুপায় অসদুপায়ের কোন বিচার করেননি। তবে সে সময়ে আমাদের গ্রামে ধার্ম্মিক ব'লেও তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। কারণ, পূজাপার্ব্বণ, ঠাকুরবাড়ীতে দানধ্যান এসব তিনি খুব করতেন। আমাদের গ্রামে সর্ব্বপ্রধান বিগ্রহ মদনমোহনদেব। রথযাত্রা ও গোষ্ঠ-বিহারের সময়ে মদনমোহন যখন তাঁর মন্দির ছেড়ে একটু দূরে রথে উঠতে যেতেন, তখন আমাদের বাড়ীতে তাঁকে বিশ্রাম করতে হ'ত এবং সে উপলক্ষে পূজা, অর্চ্চনা, ব্রাহ্মণভোজন, বৈষ্ণবভোজন এসবই মহাসমারোহে হ'ত। সুতরাং বাবার উপার্জ্জনের কথা কেউ ভাবতেন না, তিনি পরম ধার্ম্মিক বলে'ই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আরও একটা কথা গোপন ক'রে কোন লাভ নেই। কলকাতায় তিনি চাকুরী করতেন, এক বা দেড় বছর অন্তর বাড়ীতে আসতেন, উপায়ও কম করতেন না। সুতরাং সেখানে তাঁর একজন সেবাদাসী ছিল, তাতে তাঁর অনেক খরচা হ'ত। আমি শুনেছি এবং স্বচক্ষেও দেখেছি, এই রকম সেবাদাসী বা সাধুভাষায় উপপত্নী সে সময়ে অবস্থাপন্ন লোকেব যেন একটা গৌরবেবই বিষয় ছিল। কেউ তাতে লজ্জাবোধ করতেন না। সমাজেও তা' নিয়ে কোন কলঙ্ক-রটনা হ'ত না। যাক্ সে কথা।

আমি যেদিন জন্মগ্রহণ করলুম, সেদিন বাবা আর জেঠামহাশয় দুই হাতে পয়সা খরচ করেছিলেন, কাঙ্গালীও যথেষ্ট বিদায় করেছিলেন। ছেলে ভবিষ্যতে কাঙ্গাল হবে, এই কথা ভেবেই বোধ হয় তাঁদের সেদিন দুঃখী কাঙ্গালীর খবর নিতে ইচ্ছে হয়েছিল। তবে শুনেছি, এ ব্যাপারের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন আমার ভবিষ্যতের শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, জীবন-পথের একমাত্র পথপ্রদর্শক, পরলোকগত সাধকপ্রবর

হরিনাথ মজুমদার, যিনি এখন বাঙ্গালীর নিকট কাঙ্গাল হরিনাথ নামে পরিচিত। আরও শুনেছি, সাধক হরিনাথ বাড়ীর সকলকে ব'লে গিয়েছিলেন যে, এ ছেলে যেদিন আঁতুড় থেকে বেরুবে, সে-দিন কেউ একে আগে কোলে করতে পারবে না, আমি কোলে করব। তাঁর সে আদেশ কেউ অমান্য করে নি, আঁতুড় থেকে বেরিয়েই প্রথম আমি তাঁরই কোলে স্থান পেয়েছিলুম। আর, সেই-দিনই যখন আমাদের গৃহবিপ্র মধুসূদন আচার্য্য আমার এক প্রকাণ্ডকায় কোষ্ঠী প্রস্তুত ক'রে এনে কাঙ্গাল হরিনাথকে বললেন—কাকা, আমার এ দাদাভায়ের রাশিনাম যোগেন্দ্রনাথ কোরো, এর ডাক-নাম তুমি এখন ঠিক কর। তিনি তখনই না ভেবে চিন্তে বলে' বস্‌লেন—হলধর কাকার ছেলের নাম আবার কি হবে, জলধর হবে। বুঝেছ ভাই নরেন, এ নামটা যে কাঙ্গাল হরিনাথ সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' থেকে ধার করেন নি, তার প্রমাণ এই যে, তখনও দীনবন্ধু মিত্রের কোন নাটক প্রকাশিত হয় নি। নামের মিল রাখতে গিয়ে তিনি হলধরের পুত্রকে জলধর নাম দিয়েছিলেন এবং তারপর আমার ছোট ভাই জন্মগ্রহণ করলে, তারও নামকরণ কাঙ্গালই করেছিলেন শশধর। তারপর তখনই আমার কোষ্ঠীর ডাক-নামের যে জায়গাটা মধুসূদন আচার্য্য মহাশয় ফাঁক রেখেছিলেন, আমাদের বাড়ীতে বসেই সেই শূন্যস্থান পূর্ণ হ'ল, আমার এই নিরাকার নাম দিয়ে এবং আমার কোষ্ঠীপত্রেও দেখেছি, সে নামটা কাঙ্গাল হরিনাথেরই স্বহস্ত-লিখিত। কোষ্ঠীখানি হারিয়ে গিয়েছে, নইলে আমার পরমারাধ্য কাঙ্গালের হাতের লেখাটা ঠিক ঠিক ছাপিয়ে দিতাম। এইখানেই আমার রাশিচক্রটা তুলে দি, তার থেকে সকলে আমার অদৃষ্ট বিচার করুন।

১৭৮১।১১।০।৪০।২৩

১লা চৈত্র মঙ্গলবার ১২৬৬ রাত্রি ১০টা ২২ মিঃ।

ইং ১৩ই মার্চ্চ ১৮৬০।

দেখ শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ, যে ভাবে বল্‌তে আরম্ভ করেছি, এমন ক'রে বল্‌লে জীবনের বাকী কয়টা দিনেও আমার বাকী কথা শেষ হবে না। তার বদলে ছেলেবেলার কথাটা একটু ডিঙ্গিয়ে চলা যাক।

আমার বয়স যখন তিন বছর, আমার ছোট ভাই শশধরের বয়স যখন ছ' মাস, সেই সময়ে আমার পিতার মৃত্যু হয়। তখন শিয়ালদহ থেকে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ কুষ্টিয়া অবধি খুলেছিল। এই রেলপথ কবে

খোলে, তার সন-তারিখ আমার মনে নেই। এই রেলপথ খুলতে বাবা একবার বাড়ীতে এসে, আমার পিস্‌তুতো বড় ভাই বঙ্কুবিহারী ব্রহ্মকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে এক চাউলের মহাজনের আড়তে চাকরি ক'রে দেন। নির্ব্বান্ধব স্থানে অন্ততঃ ভাগ্নেটি কাছে থাকে, এই তাঁর অভিপ্রায় ছিল। আমার পিসীমার ছোট ছেলে রাসবিহারী ব্রহ্মও তখন আমাদেরই গ্রামে এক মহাজনের চাকরিতে নিযুক্ত হন। আমার বড়দাদা, অর্থাৎ আমার জেঠতুতো ভাই শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন তখন আমাদের গ্রামে ইংরাজী স্কুলে পড়েন, আর তাঁর ছোট ভাই কৃষ্ণনাথ সেন বাঙ্গলা স্কুলে পড়েন। জেঠামশায় তখন রাজসাহী জেলার গালিমপুরে চাকুরী করেন। এই সময়ে একদিন কোন সংবাদ না দিয়ে আমার পিস্‌তুতো ভাই বাবাকে বাড়ী নিয়ে এলেন। কলকাতায় বাবার জ্বর হয়ে গায়ে দুটো একটা বসন্ত বেরুতেই আমার পিস্‌তুতো ভাই বুদ্ধি খাটিয়ে কাপড়-চোপড় ঢাকা দিয়ে, জ্বর হয়েছে বলে তাঁকে রেলে কুষ্টিয়ায় নিয়ে আসেন। সেখান থেকে নৌকা ক'রে আমাদের বাড়ীর ঘাটে এসে পৌছান। নদী থেকে আমাদের বাড়ী দূর ছিল না। কিন্তু বসন্তরোগী ব'লে বেহারারা ভাড়া নিতে চাইল না। শেষে কোনরকম ক'রে খাটে শুইয়ে তাঁকে বাড়ীতে আনা হ'ল। বাড়ীতে এসে তিনি এগারদিন বেঁচে ছিলেন। আমার বড়দিদি অর্থাৎ আমার জাঠতুতো বড় ভগ্নী দিন-রাত তাঁর সেবাশুশ্রূষা করতেন। আমাদের গ্রামের মধুসূদন মালাকর সে সময়ে আমাদের অঞ্চলে সর্ব্বপ্রধান বসন্ত-চিকিৎসক ছিলেন। তিনি কত চেষ্টা করলেন, কিছুতেই কিছু হ'ল না। জেঠামহাশয়কে বাড়ী আসবার জন্য চিঠি লেখা হ'ল। কিন্তু তখন ত আর একালের মত ডাকের সুবিধা ছিল না, টেলিগ্রাফের

ব্যবস্থাও হয় নি, এবং যাতায়াতেরও সুবিধাও ছিল না। কাজেই বাবার মৃত্যুর দুদিন পরে জেঠামশায় বাড়ী এলেন।

বাবা যে ঘরে ছিলেন, সে ঘরে বড়দিদি ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। বড়দিদির কাছে পরে আমরা শুনেছি, মৃত্যুশয্যায় প'ড়ে বাবা সর্ব্বদাই বলতেন, ওরে তোরা কিছু ভাবিস্ নি, আমি তোদের ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছি না, দাদা আসুন কোথায় কি আছে সব ব'লে যাব। ক্রমেই যখন অবস্থা খারাপ হ'তে লাগল, তখন একদিন বড়দিদি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কাকা, বাবা ত আজও এলেন না, তুমি ত কিছুই বল্‌ছো না, এদের নিয়ে কি শেষে ভিক্ষা ক'রে খাব! তাতে বাবা উত্তর দিয়েছিলেন—তোদের ভয় নেই রে, দ্বারকানাথের এখানকার পড়া শেষ হ'লে বিলেত যাবার জন্যে পনের হাজার টাকা রেখে দিয়েছি, তাকে আমি হাকিম করব, সুসারের বিয়ের জন্য পাঁচ হাজার টাকা রেখে দিয়েছি। আর এদিক্ ওদিক ছড়ানও দশ-পনের হাজার আছে। তোরা ত সব বুঝবি নে, সে সব কাগজপত্র বন্ধুর কাছে আছে, দাদা এলেই বুঝিয়ে দেব। সে বোঝান আর হ'ল না, বাবার মৃত্যুর দুদিন পরে জেঠামশায় বাড়ী এলেন। আমার পিস্‌তুতো ভাই জেঠামশায়কে বললেন—ছোটমামা কোথাও কিছু রেখে যান নি, বরঞ্চ আমার মনে হয়, তাঁর কিছু ধারই আছে। কিন্তু বড়দার মুখে শুনেছি, সেদিনও তিনি বলতেন—"কাকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ ক'রে এসে, সেই রাত্রিতে আমাদের পিস্‌তুতো দুই ভাই একটা ঘরের মধ্যে দোর দিয়ে অনেক কাগজ পত্র পুড়িয়েছিলেন। আমার ঘুম হচ্ছিল না, কাগজ পোড়ার গন্ধ পেয়ে উঠে গিয়ে দোরের ফাঁক দিয়ে স্বচক্ষে দেখেছি, অনেক দলিলপত্র, অনেক হিসাবের খাতা তাঁরা পুড়িয়ে

ফেলেছিলেন।" সুতরাং আমার পিতার মৃত্যুর পর আমরা শুধু পিতৃহীন হলাম না, পথের ভিখারী হয়ে পড়লুম।

২

বাবা মারা যাবার দু'দিন পরে জেঠামশায় বাড়ীতে এলেন। তিনি আর চাকরীতে গেলেন না। কিন্তু এমন কিছু সম্পত্তি ছিল না, যার উপর নির্ভর করে' বাড়ী বসে' থাকা যেতে পারে। সুতরাং এত বড় পরিবারটা চেপে পড়ল আমার দুই পিসতুতো ভাইয়ের ওপর। তাঁরাই আমাদের সকলের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু বছর দুই যেতে না যেতেই জেঠামশায় বুঝতে পারলেন যে, এ ভার বইতে তাঁর ভাগ্নেরা সম্পূর্ণ ইচ্ছুক নন, অথচ একথা মুখ ফুটে বলতেও পারেন না। জেঠামশায় তাঁদের ভার কিঞ্চিৎ লঘু করবার অভিপ্রায়ে আমাদের গ্রামের জমিদার ঠাকুরবাবুদের তহশীলদারী গ্রহণ করলেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডারও হলেন। আমাদের গ্রামে তখন ফৌজদারী ও মুনসেফি আদালত ছিল। কুমারখালি তখন একটা সবডিভিশান। কুষ্টিয়া থেকে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হলে, এই কুমারখালি সবডিভিশানই গোয়ালন্দে চলে যায় এবং আমাদের গ্রাম নদীয়া জেলার অন্তর্গত হ'য়ে, কুষ্টিয়া সবডিভিশানভুক্ত হয়। এই সবডিভিশানের কথা পরে আরও বলতে হবে, এখন সে কথা থাক।

জেঠামশায় যখন আমাদের সংসারে কিছু কিছু সাহায্য করতে লাগলেন, তখন আমার যে পিস্‌তুতো ভাই কলকাতায় চাকরী করতেন, তাঁকে আর মাসে মাসে বাড়ীর খরচ পাঠাতে হ'ত না। জেঠামশায়ই নিষেধ ক'রে দিয়েছিলেন। আমার সেই পিস্‌তুতো ভাই তখন প্রস্তাব করলেন যে, বড়দাদাকে তিনি কলকাতায় নিয়ে পড়াবেন। তিনি

বলেছিলেন, ছোট মামার ভারি ইচ্ছা ছিল যে, দ্বারিককে ভাল রকম ইংরেজী লেখাপড়া শেখাবেন। গাঁয়ের ইংরাজি স্কুল থেকে কলকাতায় স্কুল অনেক ভাল, আমি ওকে কলকাতায় নিয়ে যাই—এই ব'লে তিনি বড়দাদাকে কলকাতায় নিয়ে গেলেন এবং সেখানে ডাফ কলেজে ভর্ত্তি ক'রে দিলেন। সেইবারই বড়দাদা প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন, দুর্ভাগ্যক্রমে পাশ হ'তে পারেন নি। তারপরের বছরও তিনি পাঠ আরম্ভ করেন। মেজদাদাও তার পূর্ব্বে গ্রামের স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পাশ ক'রে ইংরাজি স্কুলে পাঠ আরম্ভ করে' দেন। আমিও তখন বাঙ্গলা স্কুলে যাই-আসি ; কিন্তু আমার আর পড়া হয় না। ছ'মাস পড়তে পাই আর ছ'মাস পড়া বন্ধ। এই পড়া-বন্ধের ইতিহাসটা বলে' নি।

আমার বয়স যখন ছয় কি সাত বছর, তখন বুঝতে পারা গেল যে, আমার চোখের কিছু একটা অসুখ হয়েছে। তখন আমাদের পাড়াগাঁয়ে এত ডাক্তারের ছড়াছড়ি ছিল না, হাতুড়ে কবিরাজই একমাত্র সম্বল ছিল। সুতরাং আমার চোখে যে কি অসুখ হ'ল, তা' আমাদের গ্রামের কবিরাজ হরিমোহন সেন ধরতেই পারলেন না। সেই সময়ে হালিসহর থেকে প্যারিমোহন গুপ্ত নামক একটী ভদ্রলোক এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করবার জন্যে আমাদের গাঁয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনিও আমার চোখ দেখে কিছু ঠাহর করতে পারলেন না। অনেক টোটকাটুটকি ব্যবহার করা হ'ল, তাতে উপকার না হয়ে অপকারই হ'ল। শেষে এই হ'ল যে, বৈশাখ থেকে ভাদ্র-আশ্বিন পর্য্যন্ত এই ৫।৬ মাস আমি মোটেই চোখে দেখতে পেতুম না। একবারে অন্ধ হয়ে যেতুম। চোখের ভেতরে একটা সাদা পরদা উঠে সেটা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়ে, আমার চোখের তারকা ঢেকে ফেলত, দৃষ্টিশক্তির লোপ হয়ে যেত। আবার শীত পড়তে না পড়তেই সে পরদাটা স'রে যেত, আমারও দৃষ্টিশক্তি ফিরে

আসত। সুতরাং আমি সে সময়ে ৬ মাস অন্ধ, ৬ মাস চক্ষুষ্মান্। সে জন্যে আমার লেখাপড়াও আধাআধি মত হ'ত।

বাঙ্গলা স্কুলে আমি বাঙ্গলাসাহিত্যে খুব কৃতী হয়ে উঠলুম। অবশ্য সেটা আমার নিজের গুণে যত না হউক, কাঙ্গাল হরিনাথের আশীর্ব্বাদে আর তাঁর শিক্ষার গুণে। আমি যখন বাঙ্গালা স্কুলে প্রথম ভর্ত্তি হই, সেই সময়েই হরিনাধ তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় বঙ্গবিদ্যালয়েব ভার তাঁর কৃতী ছাত্র পুলিনচন্দ্র সিংহেব ওপব দিয়ে, আমাদের গ্রামে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবার ভার নিয়েছিলেন এবং সেই বিদ্যালয়েরই শিক্ষকতাকার্য্য গ্রহণ কবেছিলেন। সে-সব কথা পবে বিশেষ করে' বলতে হবে; কারণ আমার ক্ষুদ্র নগণ্য জীবনের কথা, কাঙ্গাল হরিনাথের জীবন-কথার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং তার বিস্তৃত বিবরণ প্রয়োজন। আমার বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের বৎসরের ছ'মাসের শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার এই যে, আমি সে সময়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করলেও, বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে শুধু বাঙ্গলা স্কুল কেন, ইংরাজী স্কুলের ছাত্রগণেরও অগ্রগণ্য ছিলাম। সব গোল বাধিয়েছিল ঐ অঙ্কশাস্ত্র। অঙ্কবিদ্যায় আমার মত গাধা গ্রামের স্কুলে কেন, গ্রামের সীমানার মধ্যে ছিল কিনা সন্দেহ। ঐ ক্ষেত্রতত্ত্ব আর পাটীগণিত, এই দুটো কিছুতেই আমার মাথার মধ্যে প্রবেশ করত না, অথচ সে সময়ে সকলেই বলতেন যে, আমাব দেহের গঠনের অনুপাতে মাথাটা নাকি বড় ছিল। সে মাথার ভেতর বোধ হয় বাঙ্গলা সাহিত্যই সবখানি যায়গা জুড়ে বসেছিল। আর তার জোবেই একবার যখন স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের স্কুল পরিদর্শন করতে যান, সে সময়ে কি যেন কি একটা করুণ রসাত্মক আবৃত্তি ক'রে তাঁর চোখের জল টেনে বার করেছিলুম, আর তাঁর কাছ থেকে তিনখানা বাঙ্গলা বই তখনই পুরস্কার আদায় করেছিলুম।

এই চাপরাসের জোরে, আর কাঙ্গাল হরিনাথের আদরে আমি প্রতি বছরে ক্লাস প্রমোশন পেতাম। কিন্তু কোনবারও অঙ্কের পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫ নম্বর পেয়েছি কিনা, সন্দেহ। আর এখন হয়ত দাগ মিলিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সে সময়ে আমাদের দ্বিতীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণপ্রবর কেদারনাথ জোয়ারদার মহাশয়ের এমন দিন যায় নি, যেদিন একখানি খেজুরের ডাল বেত্ররূপে পরিণত হয়ে আমার পৃষ্ঠে তার উদ্ভিজ্জীবন পরিসমাপ্তি করে নি। এত যে মার খেতাম, তবুও পাটীগণিত আর ক্ষেত্রতত্ত্ব আমার বেত্রাঘাত-যন্ত্রণাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে মাথার বাহিরে দাঁড়িয়ে হাসত।

চোখে দেখিনি, তবে শুনেছি, ল্যাপল্যাণ্ড দেশে নাকি ছ'মাস রাত্রি থাকে, ছ' মাস দিন হয়। ভগবান বোধ হয় আমাকে সেই ল্যাপল্যাণ্ড দেশে পাঠাবার জন্যে গড়েছিলেন, এমন সময়ে আমার মা-বাপের কাতর প্রার্থনায় তাঁর আসন টলেছিল, তাই আমাকে ল্যাপল্যাণ্ডে না পাঠিয়ে একবারে বাঙ্গালাদেশে পাঠিয়েছিলেন। এমন করে' প্রতি বৎসর ছ' মাস অন্ধ হয়ে বসে' থাকলে, বড় মানুষের ছেলের হয়ত চলতে পারে, কিন্তু আমার মত কপর্দ্দকহীন গরীব কায়স্থের ছেলের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হওয়া একেবারেই অসম্ভব। দেশে যতটুকু চিকিৎসা হ'তে পারে, তা' করে'ও যখন কোন ফলই হ'ল না, তখন জেঠামহাশয় হাল ছেড়ে দিলেন, মা ও জেঠাইমা কান্না সুরু করলেন। সকলেরই আশঙ্কা হ'ল যে, ছ' মাসের অন্ধত্ব বাড়তে বাড়তে বারমাসে গিয়ে পৌছবে। আমি চিরজীবন অন্ধ হয়েই থাকব।

সেই সময়ে কয়েক দিনের জন্যে আমার পিস্‌তুতো ভাই বঙ্কুবিহারী বাড়ী এসেছিলেন। মা ও জেঠাইমা তাঁকে ধরে' বসলেন যে, আমায় কলকাতায় নিয়ে গিয়ে একবার ভাল ডাক্তার দিয়ে চোখ দুটো পরীক্ষা

করাতে হবে। আমার পিস্‌তুতো ভাই কি করেন, বাড়ীর সকলের কাতর অনুরোধে তিনি আমায় কলকাতায় নিয়ে যেতে স্বীকার করলেন। চোখের চিকিৎসা হউক না হউক, অন্ধত্ব ঘুচুক না ঘুচুক, রেল চড়া হবে, কলির সহর কলকাতা দেখা হবে, এই আনন্দ আমাকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছিল। কোনদিন বাড়ী ছাড়া হইনি, দূরদেশে যেতে হবে, সেখানে মা-বোন কেউ নেই, হয়ত কত কষ্ট হবে—এসব কিছুই আমার মনে হ'ল না। আমি কলকাতা যাবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। শুভ দিনে আমার সেই পিস্‌তুতো ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতায় চলে' এলুম। সেটা কোন সাল, তা' আমি পুঁথিপত্র না দেখে মুখে-মুখেই বলতে পারচি নে। যাঁরা ঐতিহাসিক, তাঁরা সালটা ঠিক ক'রে নেবেন, কারণ সেই সালেই হাইকোর্টের বিচারপতি নর্ম্মান সাহেবকে আবদুল্লা নামে এক পাঠান টাউন-হলের সিঁড়ির মধ্যে খুন করে। তখন নূতন হাইকোর্ট-বাড়ী হয় নি, টাউনহলেই হাইকোর্ট বসত। আর তার অব্যবহিত পরে ভারতের বড়লাট লর্ড মেও আন্দামান দ্বীপে একজন দায়মালী বন্দী সিয়ার আলির হাতে নিহত হন! আর এইটুকু মনে আছে, সেদিনটা সরস্বতী পূজার আগের দিন। কারণ সরস্বতী পূজার দিন জোড়াসাঁকো শ্যাম মল্লিকের বাড়ী আমার পিস্‌তুতো ভাইয়ের নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে অনেক গানবাজনা, আমোদপ্রমোদ হ'বে ব'লে দাদা সন্ধ্যার সময়ে আমায় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। শ্যাম মল্লিকের বাড়ী গিয়ে দেখি সব নিস্তব্ধ, পূজা-প্রাঙ্গনে অল্প কয়েকটী আলো জ্বলছে। তখন জানতে পারা গেল, আন্দামানে বড়লাট সাহেব খুন হয়েছেন, তাইতে সহরের সরস্বতীপূজার আমোদ, আনন্দ, সমারোহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি ছেলেমানুষ, সবে কলকাতায় এসেছি, সাতপুকুরের বিখ্যাত বাগানের মালিক শ্যাম মল্লিকের বাড়ী কত নাচ গান দেখব শুনব, সে সব কিছুই হ'ল

না সেই নৈরাশ্যের কথাটা এই বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত আমার মনে আছে।

তখনকার কলকাতার কথাও একটু বলি। তখন গঙ্গার ধারে রাস্তা হয়নি, হাবড়ার পোল তখন তৈরী হচ্ছে। সহরের অলিগলিতে তখন শিয়াল ডাকত। মিউনিসিপ্যালিটীর এমন সুবন্দোবস্ত ছিল না। ঘোড়ার গাড়ী আর পাল্কী ছাড়া যানবাহনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। জলের কল তখন সবে হয়েছে, কি হব-হব হয়েছে, ঠিক আমার মনে নেই। ব্রাহ্মসমাজের কেশব সেন অগ্র-পশ্চাৎ সেই সময়েই বোধহয় বিলেত থেকে ফিরে এসেচেন। মেছোবাজারে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত হয়েচে। একথাটি বলচি এই জন্য যে, আমার সেই পিসতুতো ভাই কেশব সেনের চেলা হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমিও ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রতি রবিবারে যেতাম। কেশববাবু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অঘোরবাবু, গৌরগোবিন্দবাবু ও আরও বড় বড় ব্রাহ্ম আমাকে ভাল বাসতেন। দাদার সঙ্গে আমি আদি ব্রাহ্ম-সমাজেও গিয়েছি। একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও গায়ক বিষ্ণুবাবুর সম্মুখে আমি পড়েছিলুম। দাদা আমাকে তাঁর ছোট ভাই বলে' পরিচয় করে' দিলে, আমি তাঁদের দু'জনকেই প্রণাম করেছিলুম। মহর্ষি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। সে আশীর্ব্বাদের কথা আমি এখনও ভুলিনি।

সে কথা থাক, যে জন্য কলকাতায় এসেছিলুম, সেই কথাটাই বলেনি।

সেটা আমার চোখের চিকিৎসার কথা। চোরবাগানের পরলোকগত লালমাধব মুখোপাধ্যায় সে সময়ে কলকাতায় একজন বেশ বড় চিকিৎসক ছিলেন। চক্ষুরোগের চিকিৎসায় তাঁর বেশ সুযশ ছিল। প্রথম মাসখানেক তিনিই চিকিৎসা করলেন। কোনই সুফল হ'ল

না। আমি যেমন অন্ধ তেমনই থাকলাম। তখন কলিকাতায় চক্ষু রোগের সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসক ছিলেন Dr. Macnamara, শুনতে পাই তাঁর মত চক্ষুরোগের চিকিৎসক ভারতবর্ষে আর কখনও আসে নি। লালমাধববাবুর চিকিৎসায় যখন কোন ফল হ'ল না, তখন মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে Dr. Macnamaraকে দেখানই স্থির হল। কলেজে Outdoor রোগী হয়ে দেখালে, চিকিৎসকেরা কোন রকমে ব্যাগার শোধ দেন, এ বিশ্বাস তখনও লোকের ছিল। সেইজন্য একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিকে মুরব্বি স্থির করার ব্যবস্থা হ'ল। সৌভাগ্যক্রমে আমার দাদার সঙ্গে লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক পরলোকগত দুর্গাদাস কর মহাশয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। দুর্গাদাসবাবু সমস্ত অবস্থা শুনে, নিজেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে Macnamara সাহেবের বাড়ীতে গেলেন। আমার অবস্থার কথা শুনে সাহেবের দয়ার সঞ্চার হ'ল। তিনি নানারকম যন্ত্রের সাহায্যে আমার চক্ষু পরীক্ষা ক'রে বললেন যে, চোখে অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে কোন ফল হবে না। আবার তেমনি পর্দ্দা বেড়ে চোখের নেত্র ঢেকে ফেলবে। তিনি তখন ঔষধ প্রয়োগেরই ব্যবস্থা করলেন এবং প্রতি সপ্তাহে রবিবারে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। আমি গরীব ব'লে তিনি যে ছ'মাস আমার চিকিৎসা করেছিলেন, সেই ছ'মাসই প্রতি রবিবারে পরীক্ষা করার জন্যে কোন পারিশ্রমিক ত নেনই নি, ওষুধের দাম পর্য্যন্ত নেননি। ছ-মাস চিকিৎসা করে'ও যখন কিছু হ'ল না তখন তিনি বললেন—ওষুধে বা অস্ত্র করে কিছু হবে না, বয়স একটু বাড়লে আপনিই সেরে যাবে। অত বড় চিকিৎসকের কথায়ও কিন্তু দাদা আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। তখন সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে হোমিওপ্যাথিক চিকিসার ব্যবস্থা করা হ'ল।

তখনও হোমিওপ্যাথির তত পসার হয় নি। তা' না হলেও, সে সময়ে কলকাতায় যিনি প্রধান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন, তাঁর পসার-প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। তাঁর নাম ডাক্তার বেরিনি। বেরিনি সাহেবের ডাক্তারখানা তখন লালবাজারের মোড়ের উপর ছিল। তখনও ছিল, এই অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ছিল। সেই ডাক্তারখানায় গিয়ে বেরিনি সাহেবকে চোখ দেখান হ'ল, তিনি চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। সে এক কৌতুকজনক ব্যাপার। এখন ঘরে ঘরে হোমিও-প্যাথিক ওষুধ দেখি, ব্যবহারের তেমন কড়াকড়ি নেই, পথ্যেরও তেমন কঠোর বিধান নেই। কিন্তু তখন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শুচিবায়গ্রস্ত ছিল। সপ্তাহান্তে একদিন করে' সাহেবের ডাক্তারখানায় যেতে হ'ত। তিনি তাঁর বাক্স খুলে অতি সন্তর্পণে ছোট একটি শিশি বার করে', তারই এক ফোঁটা, চার আউন্স একটা শিশিতে সমস্তটা জল ভরে' তাতে ফেলে দিতেন। তারপর ১০।১৫ মিনিট সেই শিশিটা নেড়ে চেড়ে, সেই জলের কাঁচ্চা পরিমাণ ছোট একটা কাচের গ্লাসে ঢেলে আমাকে খাইয়ে দিতেন। বাস—এই সাত দিনের ওষুধ। সাতদিনের মধ্যে আর কোন ওষুধ খেতে হ'ত না। তারপর পথ্যের কথা। নুন, লঙ্কা একবারে বাদ। মশলার মধ্যে একটু জিরে বাটা। তরকারী একবারে বন্ধ। মাছ খেতে দিতে আপত্তি নেই; কিন্তু খেতে হবে মাছ সিদ্ধ করে' একটু জিরে বাটা মেখে। মিষ্টি জিনিষের মধ্যে খুব বেশী হলে সারাদিনে এক ছটাক মিছরি, তা'ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং মোটের ওপর পথ্য দাঁড়ালো, এক বেলা দুধ-ভাত, ছোট একটুকরো মিছিরি, আর এক বেলা দুধ-সাগু। অন্য সময়ে ক্ষিদে পেলে, একটু দুধ। এই কঠোর নিয়মে পথ্য করে' ছ'মাসেও চোখের অসুখ সারলো না বটে, কিন্তু আহার-সংযম অভ্যাস হয়ে গেল। সে সংযম এখন পর্য্যন্ত আমার আছে।

প্রায় দু-বছর এমনি করে কাটিয়ে, যখন কিছুই হ'ল না, তখন অন্ধত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলাম।

আমি যখন চোখের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসেছিলাম, তখন আমার বড় দাদা দ্বারকানাথ সেন ডাফ কলেজে পড়তেন। তার আগের বছরে এণ্টান্স পরীক্ষায় ফেল হয়ে, সেবার পুনরায় পরীক্ষা দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে এমনই কাঁচা ছিলেন যে, দ্বিতীযবারও তাঁর পাস হবার কোনই সম্ভবনা ছিল না। আবার ফেল হবার ভয়ে একদিন কাউকে কিছু না বলে কলকাতা থেকে পলায়ন করলেন। দাদাকে না দেখে, এই বিদেশে আমিও কেঁদে আকুল। আমার পিসতুতো ভাই সহরময় অনুসন্ধান করলেন, পুলিসে পর্য্যন্ত খবর দিলেন। কিন্তু বড়দাদর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। প্রায় পনের দিন পরে বাড়ী থেকে জ্যেঠামহাশয় চিঠি লিখলেন যে, বড়দাদা পালিয়ে একেবারে রাজমহলে গিয়েছেন এবং সেখানকার ইংরাজি স্কুলে (?) হেডমাষ্টারী (?) চাকরী নিয়েছেন। সেখান থেকে মাস ছয়েক পরে, গ্রীষ্মের ছুটিতে বড় দাদা বাড়ী এলেন, আর তাঁর রাজমহলে ফিরে যাওয়া হ'ল না। আমাদের গ্রামে তখন সবডিভিশান ছিল, তিনি সবরেজেষ্ট্রী অফিসে হেড ক্লার্কের পদ পেলেন। মাসিক বেতন ২০৲ টাকা। সে সময়ে আমাদের কুমারখালির সবডিভিশনাল অফিসর ছিলেন পরলোকগত কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তার কিছুদিন পরেই আমি কলকাতায় থাকতে থাকতেই ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে কুষ্টিয়া থেকে গোয়ালনন্দ পর্য্যন্ত রেল লাইন খুলেছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের গাঁয়ের সবডিভিশান গোয়ালন্দে স্থানান্তরিত হ'ল। বড়দাদাও গোয়ালন্দ চলে' গেলেন।

চোখের চিকিৎসায় কিছু না হওয়ায়, আমি বাড়ী ফিরে আসবার

আয়োজন করছি, সেই সময়ে বাড়ী থেকে পত্র এল আমার জ্যেঠামশায় ওলাওঠা রোগে প্রাণত্যাগ করেচেন। তখন আর আমার বিলম্ব সহে না, আমার পিসতুতো ভায়ের সঙ্গে বাড়ী এলুম। কোন রকমে জ্যেঠা-মশায়ের শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। বড়দাদা গোয়ালন্দে চলে' গেলেন, মেজ দাদা তখন আমাদের গ্রামের ইংরাজি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়তেন, সেই সময়ে কু-সঙ্গে পড়ে তিনি পড়াশুনা ছেড়ে দিলেন।

আমি বাড়ী এসে দেখলুল, আমার ছোট ভাই শশধর আমাদের গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়চে। আমি যদি তখন বাঙ্গলা স্কুলে ভর্ত্তি হই, তা' হলে সম্ভবতঃ তার নীচের শ্রেণীতে আমায় ভর্ত্তি হতে হয়। ছোট ভায়ের নীচের ক্লাসে বড়ভাই পড়বে, এ কি ক'রে হয়! আমি বললাম, আমাকে ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি করে' দাও। তাতে বাড়ীর সকলেরই আপত্তি, বিশেষতঃ বড় দাদার। তিনি নিজে ভুক্তভোগী কিনা। গোড়া থেকেই ইংরাজি স্কুলে পড়ে' তাঁর বাঙ্গলার বিদ্যে অতি চমৎকার হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতাবশেই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, ভাল করে' বাঙ্গলা না শিখিয়ে, তিনি আমাদের দু'ভায়ের কাউকেই ইংরাজি পড়তে দেবেন না। শেষে স্থির হ'ল, আমি গোয়ালন্দে গিয়ে সেখানকার মাইনর স্কুলে পড়ব। গোয়ালন্দে তখন সবে একটী মাইনর স্কুল বসেছে।

আমি গোয়ালন্দে গেলে বড় দাদা বললেন, স্কুলে ভর্ত্তি হতে গেলে একেবারে A. B. C. D. ক্লাসে ভর্ত্তি হতে হবে। তার থেকে তুই যদি বাসায় আমার কাছে মন দিয়ে পড়তে আরম্ভ করিস, তা'হলে ছ'মাসের মধ্যে মাইনর থার্ড ক্লাসের মত ইংরাজি আমি শিখিয়ে দিতে পারব। আমিও তাই স্বীকার করলুম। কিন্তু ভয় সেই অন্ধত্ব—আর দু' মাস পরে যখন অন্ধ হয়ে পড়ব, তখন পড়ার কি হ'বে? এই কথা ভেবে আমি

সত্যি সত্যিই ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলুম। আমার বয়স তখন এগার বৎসর।

গোয়ালন্দে এক আত্মীয়ের গলগ্রহ হয়ে দুই ভাই থাকি, সে অবস্থায় আমার মন যে কি ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল, তা' এখনও আমার মনে আছে। আমার বেশ মনে আছে, প্রতিদিন রাত্রে যখন সকলে ঘরের আলো নিবিয়ে ঘুমুতেন, আমি তখন সেই অন্ধকারে বসে' ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতুম—"হে ঠাকুর, আমার চোখের অসুখ সারিয়ে দাও।" পিতৃহীন দরিদ্র সন্তানের এই কাতর আবেদন, এই আর্ত্ত প্রার্থনা সত্য সত্যই ভগবানের চরণে পৌঁছেছিল, নইলে কলকাতার সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসকেরা যে ব্যধি আরোগ্য হবে না বলে আমায় নিরাশ করে' ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেই ব্যাধি দূর করবার জন্যে পদ্মাতীরে দরিদ্রের কুটীরে সহসা এক চিকিৎসকের আবির্ভাব হ'বে কেন! কি আশ্চর্য্য উপায়ে আমার চোখের অসুখ চিরদিনের মত সেরে গিয়েছিল, সে কথা বলতে গেলে এখনও আমার অবিশ্বাসী হৃদয় বিশ্ববিধাতার চরণে নত হয়ে আসে, এখনও তাঁর মঙ্গল-হস্ত আমার ওপর প্রসারিত দেখতে পাই। এখনও প্রাণ খুলে বলতে ইচ্ছা করে—

"একি করুণা তোমার ওহে করুণানিধান—
অধম সন্তানে প্রভু, এত তোমার করুণা কেন?
আমি সতত তোমারে ছেড়ে, থাকিতে চাই দূরে দূরে
তবু তুমি প্রেমভরে কর মোরে আলিঙ্গন।"

সকালে ও রাত্রে বড় দাদার কাছে একটু একটু ইংরেজি পড়ি, পড়ায় মোটেই মন লাগে না। শুধুই মনে হয়, আর ক'দিন পরেই যখন চোখের দৃষ্টিলোপ হ'বে, তখন সেই পাঁচ ছ'মাসের অন্ধকারের মধ্যে সব ডুবে যাবে। তারপরে আবার দৃষ্টি ফিরে এলে, নূতন করে

A B C আরম্ভ করতে হ'বে। এই ভেবেই পড়ায় আমার মন লাগত না। আমার বয়সের ছেলেরা কত খেলাধূলা করে, দৌড়াদৌড়ী করে, আমোদ আহ্লাদ করে, আমি তাতে যোগ দিতেই পারি না, সে ইচ্ছাই আমার করে না। আমি চুপ করে' এক স্থানে বসে থাকি। এই ভাবে কিছুদিন গেলে এক অভাবনীয় ঘটনায় আমার ভাগ্য প্রসন্ন হ'ল। আমরা যাঁর বাসায় থাকতাম, তিনি আমাদের স্বগ্রামবাসী। আমাদের বাড়ী আর তাঁদের বাড়ী গায়ে-গায়ে লাগা। তিনিও কায়স্থ। আমরা তাঁকে ঠাকুরদাদা বলে' ডাকতুম। তাঁর নাম ৺হরিমোহন সরকার। তিনি কণ্ট্রাকক্টরী করে' অনেক টাকা উপার্জ্জন করতেন। তা' ছাড়া তাঁর কয়েকটা নীলকুঠীও ছিল। আমাদের ঐ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ নীলকর মিষ্টার কেনি যখন প্রজাবিদ্রোহে বিব্রত হয়ে নীলকুঠী বেচে দেশে পালিয়ে যান, সেই সময়ে তাঁর প্রধান নীলকুঠী সালঘর বুঁদিয়া আমার এই দাদামশায়ই ক্রয় করেন। তাহার পর কয়েক বৎসর নীলের কাজে ক্ষতি স্বীকার করে' সব বেচে ফেলেন। তখন তিনি E. B. S. R.-এর loading unloading-এর কণ্ট্রাক্টার হন। ইতিপূর্ব্বে রেলওয়ে লইন নির্ম্মাণের কণ্ট্রাক্টরী করায় তাঁর যথেষ্ট সুনাম ও অর্থাগম হয় এবং সেই সূত্রেই তিনি এই বৃহৎ কণ্ট্রাক্ট লাভ করেন। এই কণ্ট্রাক্ট কার্য্য উপলক্ষ্যে তাঁহাকে প্রতি মাসেই ১০।১৫ দিন গোয়ালন্দে থাকতে হ'ত। তাঁরই বাসায় আমরা থাকতাম।

একদিন সকালে আমরা তাঁর বাসার বারন্দায় বসেছিলাম, তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময়ে একজন পশ্চিমদেশী মুসলমান সেখানে উপস্থিত হ'ল। তার পোষাকপরিচ্ছদ ভদ্রলোকের মত। মাথায় প্রকাণ্ড টুপী, পরিধানে পায়জামা ও চাপকান, পায়ে নাগরা জুতা, হাতে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ। সেই লোকটি এসে ঠাকুরদার

কাছে যে আত্মপয়িচয় দিল, তার সারমর্ম্ম এই যে, সে লক্ষ্ণৌএর রহেনেওয়ালা এবং সেখানকার একজন নামজাদা হেকিম। দেশভ্রমণে বাহির হয়েছে। গোয়ালন্দ স্থানটী অতি মনোরম, এখানে দিনকতক অবস্থিতি করবে, তারপর পূর্ব্ববঙ্গে চলে' যাবে। তার এই কথা শুনে' ঠাকুরদা তা'কে খুব খাতির করে' বসবার আসন দিলেন এবং দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতির গল্প জুড়ে' দিলেন। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরদা বললেন, হেকিম সাহেব, আমার এই নাতিটীর একটা কঠিন রোগ হয়েছে, আপনি কৃপা করে' যদি পরীক্ষা করেন, তবে বড় ভাল হয়। এই বলে' তিনি আমার চোখের রোগের বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করলেন। সমস্ত কথা শুনে হাকিম সাহেব আমাকে তাঁর কাছে ডেকে বসালেন এবং অনেকক্ষণ ধরে' চোখ পরীক্ষা করে' বললেন—এ ব্যাধি অতি সামান্য, আমি অতি সহজে আরাম করে' দিতে পারব। ওযুধপত্র কিছু দিতে হ'বে না, শুধু চোখে অস্ত্র করতে হ'বে। অস্ত্র করার কথা শুনেই ঠাকুরদাদা ভীত হলেন। বল্‌লেন, চোখে অস্ত্র করতে দিতে সাহস হয় না, এখন তবুও ছ'মাস দেখতে পায়, অস্ত্র করে' শেষে তাও পাবে না। হেকিম সাহেব বল্‌লেন, চোখের ভেতরে অস্ত্র করা হবে না, বাইরে চোখের পাতার পাশে সামান্য একটু ছিদ্র করে' দিতে হ'বে, চোখে কোনই আঘাত লাগবে না। কথা শেষ করে' তিনি তাঁর ব্যাগ খুলে অনেকগুলি কাগজ বার করলেন। সেগুলি তাঁর সার্টিফিকেট। কয়েকখানা ইংরাজিতে লেখা, কয়েকখানা হিন্দী, কয়েকখানা উর্দ্দু। ঠাকুরদা হিন্দী ও উর্দ্দু জানতেন, ইংরাজি জানতেন না। ইংরাজি সার্টিফিকেটগুলো আমার বড় দাদা তর্জ্জমা করে' সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। হিন্দী ও উর্দ্দু প্রশংসাপত্রগুলি ঠাকুরদাদা পড়ে শুনালেন।

এই সকল দেখেশুনে তাঁদের সকলেরই বিশ্বাস জন্মাল যে, হেকিম সাহেব প্রকৃতপক্ষে একজন নামজাদা সুচিকিৎসক। ঠাকুরদা তখন তাঁর ফী'র কথা জিজ্ঞেস করলেন। হাকিম সাহেব হেসে বললেন, টাকাকড়ি কিছুই দিতে হ'বে না, আমি এমনিই চিকিৎসা করব। তখন স্থির হ'ল যে, সেদিন আর অস্ত্র করা হ'বে না, পরদিন প্রাতঃকালে হেকিম সাহেব অস্ত্র করবেন।

সে দিনরাত আমার যে কি দুর্ভাবনায় গেল, তা' এতকাল পরে এখনও মনে আছে। কোথাকার কে, চিনি না, জানি না, তার হাতে চোখ দুটো সমর্পণ করা বড় সহজ কথা নয়। যে অবস্থা তখন ছিল, তাতে অন্ততঃ ছ'মাস ত দৃষ্টি থাকৃত, এবার হয়ত চিরদিনের মত অন্ধ হ'তে হ'বে। বড়দাদাও বার বার এই কথাই আন্দোলন করতে লাগলেন। কিন্তু হেকিমের ওপর বৃদ্ধ ঠাকুরদার এতই বিশ্বাস জন্মেছিল যে, তিনি কোন কথাই কর্ণপাত করলেন না। বড়ই উদ্বেগে সেই দিনরাত কেটে গেল।

পরদিন প্রাতঃকালেই হাকিম সাহেব এসে হাজির হলেন, তাঁর সঙ্গে অন্য কেউ ছিল না। তিনি বসে'ই তাঁর দীর্ঘ চাপকানের পকেট থেকে, কাগজে মোড়া লম্বামত কি একটা বার করলেন। আমার ত সেই জিনিষটা দেখেই মুখ শুকিয়ে গেল, বুক দুড়্ দুড়্ করতে লাগল, চোখেও জল এল। আমার সেই অবস্থা দেখে, হেকিম সাহেব আমার পিঠ চাপড়ে বল্‌লেন, "ডরো মত, বাচ্চা, কুচ দরদ নেই হোগা।" তারপর কাগজের মোড়ক খুললেন, দেখা গেল সুচের মত তীক্ষ্ণাগ্র একখানি অস্ত্র। হেকিম বললেন, আমাকে শুতেও হ'বে না, যেমন বসে' আছি, তেমনি বসে' থাকলেই চল্‌বে। কোন অনুষ্ঠান আয়োজনের দরকার হ'ল না। হাকিম আমার ডান চোখের ওপরের পাতা বন্ধ

করে, নাকের ঠিক পাশে তাঁর সেই তীক্ষ্ণাগ্র শলাকা সামান্য একটু বিঁধিয়ে দিলেন। সামান্য একটা কাঁটা ফুটলে যেমন বেদনা বোধ হয়, আমি ততটুকুই বেদনা বোধ করলুম। সুতরাং চীৎকার 'আহা, উহু' করতে হ'ল না। তিনি যখন শলাকাটা টেনে বার করলেন, তখন তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দু'ইঞ্চি মাপের একটা সরু শিরা বার হয়ে চোখের ওপর ঝুলতে লাগ্‌ল। সেই শিরার এক অংশ অস্ত্র করার স্থানেই আট্‌কে রইল। হেকিম সাহেব তার পকেট থেকে একটা কৌটা বার করলেন। সেই কৌটার মধ্যে একটা মলম ছিল। ক্ষুদ্র একটু কাগজে সেই মলম লাগিয়ে ক্ষতস্থানের ওপর বসিয়ে দিলেন। তারপব বললেন, চার পাঁচ দিনের মধ্যে ক্ষত শুকিয়ে যাবে, আর ঐ শিরাটা আপনা হতেই পড়ে যাবে। তিন দিন স্নান বন্ধ। আহারের ব্যবস্থা হ'ল, ঐ তিন দিন ভাত চিনি, আর কিছুই নয়। হেকিম সাহেব বললেন, তিনি দু'একদিন অপেক্ষা করবেন, তার পরই ঢাকায় চলে' যাবেন। ঢাকা থেকে ফেরবার সময়ে, এখানে দু'চার দিন থেকে অপর চোখেও অস্ত্র প্রয়োগ করবেন। এই বলে তিনি বিদায় হলেন।

দিনমান ভালই গেল, কোন রকম অসুখই বোধ করলুম না। সন্ধ্যার মুখে ভয়ানক জ্বর এল, সারারাত্রি জ্বরের জ্বালায় ছটফট করতে লাগলুম। চোখেতে কিন্তু কোন রকম যন্ত্রণা অনুভব করলুম না। বাসার সকলে চিন্তিত হলেন, কোন রকমে রাত্রি কেটে গেল। প্রাতঃকালে উঠেই বড়দাদা হেকিমের বাসায় গেলেন। তিনি ষ্টেশনের কাছে একটা দোকানে বাসা করেছিলেন। বড়দাদা সেখানে গিয়ে শুনলেন, একটু পূর্ব্বেই যে ষ্টীমার ছেড়েছে, হেকিম সাহেব সেই ষ্টীমারে ঢাকা যাত্রা করেছেন। তিনি বাসায় ফিরে এলেন, সকলে মহাচিন্তিত হয়ে পড়ল। সৌভাগ্যক্রমে বেলা ৯।১০ টার সময়ে আমার জ্বর ছেড়ে গেল। তখন

হেকিমের ব্যবস্থামত ভাত ও চিনি পথ্য পেলুম। তিনদিন ঐ ভাবেই চল্‌লো। চতুর্থ দিন প্রাতঃকালে সেই শিরাটা আপনা হতেই পড়ে' গেল। দেখা গেল, ক্ষতস্থানও শুকিয়ে গেছে। অত্যাশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, সেই সময় থেকে আরম্ভ করে' আজ পর্য্যন্ত, এই প্রায় ৬০ বছরের মধ্যে আমার চোখে কোন অসুখ হয় নি, ছ' মাসের অন্ধত্বও ঘুচে গেছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে চোখে অস্ত্রোপচার হয়নি, সেটারও অসুখ সেরে গেছে। তারপর থেকে অনুসন্ধান করেও সে হেকিম সাহেবের খবর মেলেনি। ঢাকা থেকে ফেরবার সময়ে আমাদের বাসায় আসবেন বলেছিলেন, সে কথাও তিনি রক্ষা করেন নি। এই অদ্ভুত উপায়ে আমার ছ-মাসের অন্ধত্ব ঘুচে গিয়েছে।

এইবার আমার লেখাপড়া শেখার কথা গোড়া থেকে বলি। আমাদের সময়ে সকল ছেলেকেই গোড়ায় পাঠশালায় পড়তে হ'ত। যেখানে ইংরেজী বা বাঙ্গলা স্কুল ছিল না এবং যেখানকার ছেলেদের অভিভাবককেরা সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন না, সেখানে তাঁদের ছেলেদের লেখাপড়া ঐ পাঠশালা পর্য্যন্তই। সেকালের পাঠশালা সম্বন্ধে এইখানে দু'একটা কথা বলতে চাই, যদিও আমি কখনও পাঠশালায় পড়িনি। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ "বর্ণ পরিচয়" হাতে করে বাঙ্গলা স্কুলেই প্রবেশ করেছিলুম, তা' হলেও আমাদের গ্রামে যে পাঠ-শালা ছিল তা' আমি দেখেছি। এখনও তার চিত্র আমার স্মৃতিপথে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

আমাদের গ্রামে, আমাদের পাড়ায় একজন খুব অবস্থাপন্ন তন্তুবায় ছিলেন। গ্রামের বাজারে তাঁর দেশী কাপড়ের দোকান ছিল, বাড়ীতে ৩০।৪০ খানি তাঁত চল্‌ত। বাড়ীও বড় ছিল, দোতালা অট্টালিকা। সুন্দর পূজার মণ্ডপ ছিল। সেই তন্তুবায়ের নাম রামমোহন প্রামাণিক।

তাঁর দুই ছেলে ছিল। জ্যেষ্ঠ ব্রজনাথ প্রামাণিক বিষয়কর্ম্ম দেখতেন; কনিষ্ঠ দ্বারকানাথ প্রামাণিক গ্রামের ইংরেজী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হয়ে ডাকবিভাগে চাকরী নিয়েছিলেন। ইনি ৩৫ বছর সুখ্যাতির সঙ্গে চাকরী ক'রে অবসর গ্রহণ করেন। তারপর ২৫ বছর ধরে' পেন্‌সন ভোগ করে' ইংরেজি ১৯২২ সালের শেষে দেহত্যাগ করেছেন। তাঁদের অবস্থা এখন অত্যন্তই মলিন হয়েছে। বাড়ীতে তাঁতের সম্পর্কই নেই। বিলাতী কপেড়ের প্রতিযোগিতায় দোকান উঠে গিয়েছে। প্রকাণ্ড অট্টালিকা ভেঙ্গে পড়েছে। তাঁরা যে পাড়ায় বাস করতেন, সে পাড়ার নামই তাঁতিপাড়া ছিল। আমরা বাল্যকালে দেখেছি, এই তাঁতিপাড়ায় কম করে হলেও ১৫০ তাঁত চল্‌তো। এই পাড়া থেকে যুবক-বৃদ্ধ-বালকে চার-পাঁচ শত তাঁতী বার হ'ত। এখন সে পাড়ায় একখানাও তাঁত নেই, তাঁতিপাড়া প্রায় জনশূন্য হয়েছে। দু'তিন ঘর তাঁতী কোন রকমে আছে। কেউ বা বিলাতী কাপড়ের দোকান করে; কেউ বা বিলিতী সূতা বিক্রি করে' কোন গতিকে দিন চালাচ্ছে। এই তাঁতী পাড়ার কবি-গানের দল, সঙ্কীর্ত্তনের দল আমাদের গ্রামে অপরাজেয় ছিল। অন্য পাড়ার কোন দলই এদের সঙ্গে পেরে উঠ্‌ত না। এখন আর সেদিন নেই, সব শ্মশানপ্রায় হয়েছে। এই ভগ্নাবশেষের মধ্যে রামমোহন প্রামাণিকের চণ্ডীমণ্ডপ এখনও অক্ষত শরীরে বিদ্যমান আছে। আর এই চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়ে এখনও যখন আমাদের বাড়ী যাই, তখন মানস চক্ষে সেই চণ্ডীমণ্ডপে আমার বাল্যকালের সেই পাঠশালার দৃশ্য দেখতে পাই। এই পাঠশালার যিনি গুরুমহাশয় ছিলেন, তাঁর নাম আমার মনে নেই। আমার অপেক্ষাও বয়সে বড় যাঁরা এখনও গ্রামে আছেন, তাঁদেরও জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁরাও আমারই মত সেই গুরুমহাশয়কে "বর্দ্ধমেনে মশাই" বলে'

জানতেন ও ডাকতেন। অর্থাৎ সেই গুরুমশয়ের বাড়ী বৰ্দ্ধমান জেলার কোন গ্রামে ছিল। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কি উপলক্ষে, কবে আমাদের গ্রামে বিদ্যা বিতরণের জন্য তাঁর শুভাগমন হয়েছিল, গ্রামের ইতিহাসে তা' লেখা নেই। এখনকার মত অনুসন্ধিৎসা যদি সেকালে থাকত, তাহলে আমার পরমপূজনীয় কাঙ্গাল হরিনাথের কাছে জিজ্ঞাসা করলে নিশ্চয়ই জানতে পারতুম। তাঁর যে স্বলিখিত ডায়েরী আছে, তাতেও এই "বৰ্দ্ধমেনে মশায়ের" উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন পরিচয় নেই। এই "বৰ্দ্ধমেনে মশায়"গৌরবর্ণ দীর্ঘাকার পুরুষ ছিলেন। মাথায় প্রকাণ্ড শিখা ছিল। তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চ ছিল। তিনি যখন বেত হাতে করে' হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন, তখন আমরা দূরের কথা, অন্তঃপুরচারিণী মহিলারা পর্য্যন্ত ভয়ে কম্পিত হতেন। এই গুরুমহাশয় দুৰ্দ্ধর্ষ হলেও শিক্ষাদান বিষয়ে অতি নিপুণ ছিলেন। তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আমার না হলেও, যাঁরা তাঁর ছাত্র ছিলেন, তাঁদের লেখা যে ছাপার অক্ষরের মত হ'ত, তাঁরা শুভঙ্করী ও বাজার হিসেবে সুদক্ষ হতেন, তার প্রমাণ আমাদের গ্রামে বিস্তর ছিল। তাঁর নিয়ম ছিল —শিক্ষার্থীকে প্রথমে মাটিতে 'অ-আ, ক-খ' দাগা বুলাতে হবে। একজন ছাত্র মাটিতে 'ক-খ' দেগে দিত, অন্য ছাত্ররা তারই ওপর বাঁশের কঞ্চির কলম বুলাত। এই ছিল প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কলাপাতায় ও তালপাতায় 'অ-আ-ক-খ' লিখতে হ'ত। হাতের লেখা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হওয়া প্রধান শিক্ষার বিষয় ছিল। মুখে মুখে শতকিয়া, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, নামতা শিখান হ'ত। প্রথম হ'তে দু'তিন বছরের মধ্যে পাঠশালায় কোন বই পড়ান হ'ত না। যে সব ছেলেরা 'কাগজের ক্লাসে' প্রমোশন পেত, তারাই বই পড়বার অধিকারী হ'ত। পাঠশালার সেই

একমেবাদ্বিতীয়ং বইএর নাম "শিশুবোধক"। এখনও বোধ হয় খোঁজ করলে কলকাতার বটতলায় সে বই পাওয়া যেতে পারে। আমি পাঠশালায় না পড়লেও, জ্যাঠামহাশয়ের কাজে শুনে শুনে "গঙ্গাবন্দনা" "দাতাকর্ণ' মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। এখনও মনে পড়ে—জ্যাঠামশায়ের সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে সুর করে "গঙ্গা বন্দনা" বলতাম—

বন্দ মাতা সুরধুনী পুরাণে মহিমা শুনি
পতিতপাবনী পুরাতনী

এখনও মনে পড়ে—পিসীমা মুখে মুখে শেখাতেন, একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চার বেদ, পঞ্চ বাণ, ছয় ঋতু, সাত সমুদ্র, অষ্ট বসু, নবগ্রহ, দশ দিক্। সে পাঠশালার শিক্ষা এখন উঠে গিয়েছে; সে দাতাকর্ণ, সে গঙ্গাবন্দনা নেই। এখনও পাঠশালা আছে; কিন্তু সে 'বর্দ্ধমেনে গুরুমশায়'ও নেই, সে শিক্ষাপদ্ধতিও নেই। এখন তাদের নাম হয়েছে, নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়!।

এবার আমার পড়ার কথা বলি! আমি কোন পাঠশালায় পড়িনি। খড়ি প্রভৃতি যে সকল অনুষ্ঠান শিক্ষারম্ভে করার ব্যবস্থা ছিল, সে উপলক্ষে পাঠশালার গুরুমহাশয় ও গৃহস্থের পুরোহিত মহাশয় কিছু পেতেন। আমার শিক্ষারম্ভে গুরু-পুরোহিত দু'জনেই ফাঁকিতে পড়েছিলেন। বোধহয় সেই জন্যই মা সরস্বতীর অকৃপায় আমার বিদ্যাও ফাঁকিতে পড়েছিল। আমি একেবারেই বিদ্যাসাগরের "বর্ণপরিচয়" হাতে করে ছাত্রবৃত্তি স্কুলে প্রবিষ্ট হয়েছিলাম। সে সময়ে আমাদের গ্রামের উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে আমার বড় দাদা ও মেজ দাদা দু'জনেই পড়তেন। তখনকার ইংরাজি বিদ্যার মাদকতায় বিহ্বল হয়েই বোধহয় বড়দাদা আমাকে পাঠশালা ডিঙ্গিয়ে একেবারে বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়ে

দিয়েছিলেন। কিন্তু তা'হলেও জ্যাঠামশায় আমাকে দাতাকর্ণ, গঙ্গাবন্দনা আর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের উর্দ্ধতন সাতপুরুষের নাম কণ্ঠস্থ না করিয়ে ছাড়েন নি। এখনকার ছেলেদের কেন, যুবকদেরও জিজ্ঞাসা করলে তারা পিতামহের ওপর পর্য্যন্ত যেতে পারেন কিনা সন্দেহ! আমরা কিন্তু তখন নাম, গোত্র, এমন কি প্রবরও পর্য্যন্ত বলতে পারতাম! বিশেষতঃ সে সময়ে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি সকলের ঘরেই হ'ত, সে উপলক্ষেও এ সকল শিক্ষা হ'ত। এখন বাৎসরিক বা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ একরকম উঠেই গেছে।

যাক্ সে কথা, আমার বিদ্যারম্ভের কথাই বলি। বাঙ্গলা স্কুলেই প্রথম প্রবেশ করার অপরাধ বড় দাদার স্কন্ধেই দিলাম বটে, কিন্তু আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আর এক মহাপুরুষের হাত ছিল। তিনি আর কেউ নন আমার শিক্ষাগুরু, আমার দীক্ষাগুরু, আমার জীবনের আদর্শ স্বর্গীয় হরিনাথ মজুমদার মহাশয়, যিনি পরে কাঙ্গাল হরিনাথ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। আমার জীবনের কথা বলতে গেলে, কাঙ্গাল হরিনাথের কথাও বলতে হয়। সুতরাং এখানেই তাঁর জীবনের পূর্ব্বাভাস একটু দিয়ে রাখি।

কাঙ্গাল হরিনাথ অথবা হরিনাথ মজুমদার বাঙ্গলা ১২৪০ সালে [শ্রাবন মাসে, ইং ১৮৩৩] জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে তিলি ছিলেন। আমাদের গ্রামে তখনও এবং এখনও তিলি জাতি প্রধান। বিদ্যায় প্রধান না হ'লেও, ধনে-জনে তখনও তাঁরা প্রধান ছিলেন, এখনও আছেন। এই তিলিজাতীয় মজুমদার বংশে হরিনাথ জন্মগ্রহণ করেন। আমার বোধ হয়, আমাদের গ্রামে মজুমদার মহাশয়েরা সর্ব্বপ্রধান না হ'লেও, বড় ধনী ছিলেন। এই ধনী মজুমদারদের এক শাখায় জন্মগ্রহণ করলেও' কাঙ্গাল হরিনাথের পিতা বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন না। হরিনাথের বয়স যখন দু' বছর, তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। তারই

বছর দুই-তিন পরেই তাঁর মাতাঠাকুরাণীও মারা যান। হরিনাথের আত্মীয়স্বজন অবস্থাপন্ন হ'লেও, কেউই পিতৃমাতৃহীন বালকের ভার গ্রহণ করেন নি। বালক সত্যসত্যই নিরাশ্রয় হ'য়ে পড়েছিলেন। কেউই তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রসর হ'ন নি। তাঁর এক বৃদ্ধ পিতামহী ছিলেন, তিনিই এই অনাথ বালককে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই বিধবারও গ্রাসাচ্ছাদনের বিশেষ উপায় ছিল না। তিনি কষ্টসংগৃহীত অন্নের ভাগ হরিনাথকে দিয়ে, তাকে অন্নাভাবে-মৃত্যুর হাত থেকে কিছুদিন রক্ষা করেন। যার অন্নের সংস্থান নেই, তার লেখাপড়ার ব্যবস্থা কে করবে! সুতরাং হরিনাথের বাল্যকালে লেখাপড়া শিখবার সুযোগ মোটেই হয় নি। গ্রামে গুরুমশায়ের যে পাঠশালা ছিল, তাতেই তিনি কয়েক দিনের জন্যে প্রবেশ করেন। একে অভিভাবকহীন তাতে নিঃসম্বল; কাজেই হরিনাথ পাঠশালার শিক্ষায় একেবারেই উদাসীন ছিল। তাঁরই মুখে শুনেছি, লেখাপড়ার দিকে তাঁর মোটেই মন ছিল না। এমন কি, পাঠশালায় যাবার ভয়ে একদিন তিনি সকাল থেকে বিকাল পর্য্যন্ত তাঁদের বাড়ীর কাছের একটা কূয়ায় মধ্যে লুকিয়েছিলেন। তা'হলেও পাঠশালার যা' প্রধান শিক্ষা, তা' তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। বার বছর বয়সে তাঁর হাতের লেখা অতি সুন্দর হ'য়েছিল, আর সামান্য হিসাবপত্রও তিনি করতে পারতেন। এই সময়ে তাঁর আশ্রয়দাত্রী সেই বিধবাও মারা যান। তখন তিনি দুপুর বেলা কোন ঠাকুর বাড়ীতে গি'য়ে বসে থাকতেন। বিগ্রহের ভোগ হ'য়ে গেলে, অতিথি-অভ্যাগতেরা যখন প্রসাদ পেতো, তিনিও সেই প্রসাদ পেয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি ক'রতেন। রাত্রে কেউ যদি ডেকে দিত, তা'হ'লেই তাঁর আহার হ'ত নতুবা উপবাস। তিনি আমাদের কাছে গল্প করেছেন যে, তাঁর পরার একখানি মাত্র কাপড় ছিল। সেখানি যখন এমন শতচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল যে, লজ্জা

নিবারণের আর কোন উপায় নেই, তখন গাঁয়ের এক ভদ্রলোকের একখানি গ্রন্থ নকল ক'রে দিয়ে একখানি কাপড় পান, আর তাতেই তাঁর লজ্জা নিবারিত হয়।

তাঁর এই অবস্থা দেখে বাজারের এক দোকানদার তাঁকে দোকানের চাকরীতে বাহাল করেন। তাঁর বেতন স্থির হয়—প্রতি দিন দু'টো ক'রে পয়সা। দোকানে যারা কাপড় কিন্‌তে আস্‌ত, তাদের জন্যে তামাক দেওয়া আর তাদের কাপড় গুছিয়ে দেওয়া তাঁর দিনের বেলার কাজ ছিল। সন্ধ্যার পর যখন দোকানে কোন খরিদ্দার থাকত না, সে সময়ে তাঁকে দোকানে খাতা লিখতে হ'ত। দুপুরে ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ আর রাত্রে দু'পয়সার জলপান এই ছিল তাঁর সম্বল। কিন্তু এ চাকরীও তাঁকে বেশী দিন ক'রতে হ'ল না। তিনি যে অনন্যসাধারণ মনস্বিতা ও সত্যনিষ্ঠার জন্যে পরে বরণীয় হ'য়ে গিয়েছেন, এই বাল্যকালেই তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। তিনি যে দোকানে কাজ ক'রতেন, সেই দোকানদারের অপর এক লোকের কাছে কাপড়ের হিসাবে কিছু পাওনা ছিল। এই পাওনা নিয়ে উভয় পক্ষে বিবাদ হওয়ায়, দোকানদার প্রতিশোধ নিতে দোকানের খাতা জাল ক'রে অপর পক্ষের কাছে অনেক দাবী করার মতলব করেন। দোকানদার হরিনাথকে এই খাতা জাল ক'রতে বলেন। বার বছরের বালক হরিনাথ এমন মিথ্যা কাজ ক'রতে স্বীকৃত হ'ন না। তিনি আমাদের বলেছিলেন, যখন তাঁর কাছে এই প্রস্তাব ক'রলে, তখন ঘৃণায় তাঁর সর্ব্বশরীর শিউরে উঠেছিল। তিনি তখন ভুলে গেলেন যে, ভিক্ষার অন্নে তাঁকে উদরপূর্ণ ক'রতে হয়—দোকানের এই সামান্য চাকরীটা গেলে তাঁর আর কোন উপায়ই থাকবে না। এক বেলা অনাহারেই কাটাতে হবে, কাপড়ের অভাবে দিগম্বর হ'তে হ'বে—এ কম কষ্টের কথা নয়। কিন্তু তখনই তাঁর প্রাণের মধ্যে

থেকে কে ব'লে উঠ্‌ল, ছি, ছি অমন কাজ কর না, জাল করা মহাপাপ। বার বছরের বালকের মনে তখন অমানুষিক বলের সঞ্চার হ'ল। তিনি সেই মুহূর্ত্তেই দোকানের চাকরী ত্যাগ ক'রে চলে এলেন। সত্যের ওপর এই অবিচলিত শ্রদ্ধা, হৃদয়ের ভেতর দেবতার বাণী এই দিন থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁকে পরিত্যাগ করে নি। আর কোন দিন কোন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া না শিখেও, কাঙ্গাল হরিনাথ অদ্বিতীয় সাহিত্যিক ও অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ হয়েছিলেন।

এইবার আমার লেখাপড়া শিক্ষার কথা বলি। পূর্ব্বেই বলেছি যে, আমাদের দেশের প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করে আমি পাঠশালার পরিবর্ত্তে প্রথমেই বাঙ্গলা-স্কুলে প্রবেশ করি। আমাদের গ্রামে তখন একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী স্কুল ছিল। ইংরাজী স্কুল যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনকার একটি গল্প ঐ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, আমাদের গ্রামের সে সময়ের সর্ব্বপ্রধান ধনী পরলোকগত মথুরানাথ কুণ্ডু মহাশয়ের মুখে আমি শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন—"আমাদের এ অঞ্চলের মধ্যে ইংরাজী লেখাপড়া শিক্ষার জন্যে কোন স্কুল না থাকায়, আমি চেষ্টা করে ছোটখাট একটা ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করি। আমাদের গ্রামের কৃষ্ণধন মজুমদার সেই সময় ঢাকা কলেজ থেকে সিনিয়ার পরীক্ষায় পাশ হ'ন, আমি তাঁকেই আমার স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত করি। তখন আমাদের গৌরী নদী দিয়েই বড় বড় ষ্টীমার যাতায়াত কর্‌তো। রেলগাড়ী তখনও আমাদের দেশে আসেনি। লাটসাহেব ও বড় বড় রাজপুরুষেরা ষ্টীমারে করে পূর্ব্ববঙ্গে যাবার সময় আমাদের গ্রামের নীচের নদী দিয়েই যেতেন। সেই সময় একদিন খবর পেলুম যে, হাতকাটা গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ষ্টীমার করে এদিক দিয়েই যাবেন। তাঁকে পাক্‌ড়াও করবার জন্যে আমি আয়োজন করলুম। নদীর ভাঁটিতে ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে তাকে বলে

দিলুম, দূরে ষ্টিমারের ধোঁয়া দেখলেই সে যেন ঘোড়া জোরে চালিয়ে এসে আমাকে খবর দেয়। এদিকে আমি বারো দাঁড়ওয়ালা একখানা নৌকা সুন্দর করে সাজিয়ে নদীতীরে অপেক্ষা করতে লাগলুম। আমার পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করার কোন অভ্যাস ছিল না। ইংরাজী ত দূরে থাক, বাঙ্গলা লেখাপড়াও আমি ভাল শিখিনি। কিন্তু আমার অতুল সাহস ছিল। আর সেই সাহসে নির্ভর করেই আমি বড়লাট সাহেবের ষ্টীমার আটক করতে গিছলুম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, গভর্ণর জেনারেল সাহেবকে আটক করে, গ্রামে এনে, আমার ইংরাজী স্কুল দেখাতে পারবই। এই বিশ্বাসের জোরেই আমি সকালেই যতটা সম্ভব নানারকম বাঙ্গালীর খাদ্য সামগ্রীর তৈরী করিয়েছিলুম।

"বেলা বারটার সময় ঘোড়সওয়ার এসে খবর দিলে—লাট সাহেবের ধুঁয়োকল আসছে। আমি তখন আমার সেই বার-দাঁড়ি নৌকা নিয়ে নদীর মধ্যে গেলুম। মাঝিদের উপদেশ দিয়ে রাখলুম, ধুঁয়োকল এগিয়ে এলেই ঠিক তার সামনেই যেন নৌকা নিয়ে চালিয়ে দেয়। আমি নিজে এক লাল নিশান হাতে করে নৌকার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম। ধুঁয়োকল যখন নদীর বাঁক ফিরে আমাদের গ্রামের ঠিক সামনে এলো, আমি তখন মাঝ নদীতে নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে লাল নিশান দেখাতে লাগলুম। কোন বিপদের সম্ভাবনা মনে করে ধুঁয়োকল যেই থেমে গেল, অমনি মাঝিরা বারোখানা দাঁড় ফেলে ধুঁয়োকলের পাশে লাগিয়ে দিলে। ধুঁয়োকলের কর্ম্মচারীরা ও লাট সাহেবের সঙ্গী সাহেবরা কি ব্যাপার বুঝতে না পেরে, যে দিকে আমার নৌকা লেগেছিল, সেই দিকে এসে পড়লো। তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলে 'তোম কোন্ হ্যাঁয়।' আমি ইংরাজী ত জানিই না, হিন্দিও জানতুম না। সাহেব যেই বল্লে 'তোম কোন্ হ্যাঁয়।" আমি তাড়াতাড়ি জবাব দিলুম

'আমি মথুর কুণ্ডু হ্যায়।' তখন আবার প্রশ্ন হো'ল 'ক্যায়া মাংতা।' আমি বললুম, 'লাট সাহেব মাংতা।' এই বলেই কোন আদেশের অপেক্ষা না ক'রে এক লাফে ধুঁয়োকলের ওপর চড়লুম। তখন একজন সাহেব ধুঁয়োকলের একটা কামরা থেকে বার হয়ে এলেন। আমি চেয়ে দেখলুম, তাঁর একখানা হাত কাটা। তখনই বুঝলুম ইনিই লাট সাহেব। আমি হাঁটু পেতে বসে দু'হাত তুলে তাঁকে সেলাম করলুম। লাটসাহেব ইংরাজীতে আমায় কি জিজ্ঞাসা করলেন। আমি উত্তর দিলুম—'হুজুর নো ইংলিস।' লাট সাহেব হেসে পাশের একজনকে কি বললেন। সে সাহেবটি বাঙ্গলা জানতেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাও তুমি?' আমি তাকে বললুম—'আমার নাম মথুর কুণ্ডু, এই পাশের কুমারখালি গ্রামে আমার বাস। আমি নিজের জন্য কিছুই চাই না। আমার গ্রামের ছেলেরা ইংরাজী শিখতে পায় না, সেইজন্যে এক ইংরাজি স্কুল বসিয়েছি। লাট সাহেবকে সেই স্কুলে পায়ের ধূলো দিতে হবে।' সাহেবটি লাট সাহেবকে আমার প্রার্থনা জানালেন, লাট সাহেব হেসে আমার পিঠ চাপ্ড়ে বল্লেন—"ওয়েল কুণ্ডু, আই উইল গো নাউ।' তখন আর কি, লাট সাহেব ও তাঁর সঙ্গে পাঁচ ছ'জন সাহেব আমার নৌকায় উঠলেন। নৌকা এসে স্কুলের ঘাটে লাগল। সাহেব স্কুল দেখে খুসী হলেন। হেডমাষ্টার কৃষ্ণধন মজুমদারের সঙ্গে কথা বলে আরও খুসী হলেন। তারপর বল্লেন, আমি কল্‌কাতায় ফিরে গিয়ে তোমায় স্কুলের জন্যে যা করতে হয় করবো।' তখনও গভর্ণমেণ্ট মফঃস্বলের স্কুলের জন্যে কোন ব্যবস্থাই করেননি। লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁর কথা রক্ষা করে গিয়েছিলেন। তিনি দেশে ফিরে যাবার সময় আমার স্কুলের কথা ভাল করে লিখে রেখে গিয়েছিলেন। সেইজন্যেই লর্ড ডালহৌসির সময়ে যখন প্রথম মফঃস্বলের স্কুলে সাহায্য দেবার প্রথার প্রবর্ত্তন হয়, তখন আমার স্কুলই প্রথম

সাহায্য পেয়েছিল। আমার স্কুল দেখে লাট সাহেব যেই ষ্টীমারে যেতে প্রস্তুত হলেন, তখন আমি হাত যোড় করে বল্লুম—'হুজুর একটু জলযোগ করতে হবে।' কৃষ্ণধনবাবু সেই কথা লাট সাহেবকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি বললেন—'অল রাইট।' পাশের একটা ঘরেই টেবিলে নানারকম অন্নব্যঞ্জন, পায়স, পিষ্টক, মিষ্টান্ন সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। লাটসাহেব ও সঙ্গীরা এই আয়োজন দেখে মহা খুসী হলেন। যার যা ইচ্ছা খেতে লাগলেন। একটা জিনিষ লাট সাহেবের বড়ই মুখপ্রিয় হয়েছিল। একখানা থালাতে পোস্ত দিয়ে বকফুল ভেজে রাখা হয়েছিল। লাটসাহেব তার তিনচারটে খেয়ে ভারী খুসী। তিনি আমাকে বললেন—'ওয়েল মথুর কুণ্ডু, ভেরি গুড থিং।' তারপর তাঁরা চলে গেলেন। এই বকফুল ভাজা খাইয়েই আমি আমার স্কুলের জন্যে সাহায্য আদায় করেছিলুম।"

আমার পড়াশুনার কথা বলতে গিয়ে এতক্ষণ আমাদের গ্রামের ইংরাজী স্কুল কি রকমে আরম্ভ হ'ল তারই বিবরণ বললুম। এখন আমার বিদ্যারম্ভের কথা বলি।

আমি যখন প্রথম পড়াশুনা আরম্ভ করি, তখন আমাদের গ্রামে একটা উচ্চ-ইংরাজী স্কুল, একটী বঙ্গ বিদ্যালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয়, আর দু' তিনটী পাঠশালা ছিল। এসব ছাড়া ৪।৫টি টোল ছিল। আমার বড়দাদা ত বাঙ্গলা স্কুলেই পড়েন নি। তাঁর শিক্ষারম্ভই ইংরাজী স্কুলে। মেজদাদা বাংলা ছাত্রবৃত্তি পাশ করে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হ'ন। আমার যখন স্কুলে পড়বার কথা হ'ল, তখন বড়দাদা ও মেজদাদার পরামর্শে জ্যাঠামশাই আমাকে পাঠশালায় না দিয়ে একেবারে বাংলা স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। সে সময় বাংলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন স্বর্গীয় হরিনাথ মজুমদার। তিনিই পরে সাধক কাঙ্গাল হরিনাথ নামে দেশবিখ্যাত হয়েছিলেন। বাংলা স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে কি পড়েছিলাম

না পড়েছিলাম, তা আমার মোটেই মনে নেই। আমার মনে পড়ে, যখন তৃতীয় শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠলুম। কারণ সেই সময় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রমোশন পাওয়া পর্য্যন্ত আমাকে যে লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল, তা এখনও আমাব মনে আছে। বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, এই তিন বিষয়ে আমি ক্লাসের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলুম। কিন্তু গোল বাঁধত অঙ্কের বেলায়। অঙ্কশাস্ত্র আমার কাছে বাঘের চেয়েও বেশী ভয়ের ব্যাপার ছিল। সে তিন বছরের মধ্যে এমন দিন যায় নি, যে দিন অঙ্কের মাষ্টাবের কাছ থেকে বেতের মার বা কানমলা না খেযেছি। এত নির্যাতনেও কিন্তু আমাদের অঙ্কের মাষ্টার স্বর্গীয় কেদারনাথ জোয়ারদার আমার মাথার মধ্যে পাটিগণিত বা জ্যামিতি প্রবেশ করাতে পারেন নি। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন পূজনীয় হরিনাথ মজুমদার মহাশয় বাংলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকতার ভার সুযোগ্য ছাত্র নর্ম্মাল স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পুলিনচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ওপর দিয়ে নিজে বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতির চেষ্টায় বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন। তা হ'লেও বাংলা-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব ভার তাঁর ওপরেই ছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষার তিনিই সাহিত্যের পরীক্ষক হতেন। আমি সে সব পরীক্ষায় সাহিত্যে সকলেব চেয়ে বেশী নম্বর পেতুম। কিন্তু অঙ্কে যে বার ১০০র মধ্যে ৫ নম্বর পেতুম সে বার নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করতুম। কাঙ্গাল হরিনাথ যদি মাথার ওপরে না থাকতেন, তাহলে ঐ তৃতীয় শ্রেণীতেই আমাকে জীবন কাটাতে হ'ত। গণিতে এত বড় মুর্খকেও শিক্ষকমহাশয়েরা ওপরের শ্রেণীতে উঠিয়ে দিতেন। সাহিত্যে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র, সুতরাং হরিনাথের কাছে আমার সাতখুন মাপ। এই কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা আমার প্রমোশন বন্ধ করতে পারেননি।

অঙ্কের শিক্ষক কেদার জোয়ারদার মশায় বেতের জোরে যা করতে পারেন নি, তা প্রধান শিক্ষক পুলিনচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের একদিনের একটা কার্য্যে সুসম্পন্ন হয়েছিল। তিনি একদিন আমাকে বিশেষ রকমে শাস্তি দেবার জন্যে এক সদুপায় অবলম্বন করেছিলেন। আমার বেশ মনে আছে আর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মনে থাকবে, সেদিন আমাদের ক্ষেত্রতত্ত্ব বা জ্যামিতির পাঠ ছিল। তার আগের ঘণ্টাতেই সাহিত্য পড়া হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং আমি ক্লাসের সকলের উপরে ছিলুম। এখন স্কুলে একটা নিয়ম উঠে গেছে, কিন্তু আমাদের সময়ে সে নিয়ম ছিল! কোন ছাত্রকে শিক্ষক মহাশয় একটা প্রশ্ন করলে সে যদি উত্তর না দিতে পাবে, আর তার পরের ছাত্র সেই প্রশ্নের উত্তর ঠিক দেয়, তাহ'লে তাকে সরিয়ে পরের ছাত্রই সেই স্থানে বসতে পেত। এর প্রচলিত নাম ছিল ক্লাসে উঠা-নামা। অন্য দিন যখনই অঙ্কের ক্লাস আরম্ভ হ'ত তখনই আমি ভয়ে ভয়ে নিজের জায়গা ছেড়ে একবারে সকলের শেষে অর্থাৎ লাষ্ট গিয়ে বসতুম। সেদিনও তাই করেছিলুম। কিন্তু প্রধান শিক্ষক যখন দেখলেন যে, আমি লাষ্ট ব'সে আছি, তিনি তখন আমার কান ধরে টেনে তুলে একবারে ফাষ্ট বসিয়ে দিলেন। সুতরাং প্রথমেই আমার ওপর জ্যামিতির প্রশ্ন হ'ল, আমি উত্তর দিতে পারলুম না। আমার পরে যে ছাত্র ছিল সে ঠিক উত্তর দিলে। তখন শিক্ষক মশায় আদেশ দিলেন যে, সে আমার দুই কান মলে ওপরে গিয়ে বসবে। এইভাবে ক্রমাগত আমার ওপর প্রশ্ন হ'তে লাগল, আর আমার নীচের ছাত্র সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমার কান মলে ওপরে গিয়ে বসতে লাগল। আমাদের ক্লাসে সেদিন আমরা ১৩জন ছাত্র ছিলুম। ১২ জন ছাত্রের হাতে ২৪টা কান মলা খেয়ে, আমার হৃদয় মধ্যে গণিত-অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সত্যিই নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। সেইদিন কানের যন্ত্রণায় আর

অপমানে আমি দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা করলুম, যে ক'রেই হোক আমি অঙ্কশাস্ত্র শিখ্‌বই শিখব। সত্যিই সেই কানমলা থেকেই আমার মাথার মধ্যে গণিতশাস্ত্র প্রবেশ লাভ করেছিল। তারই ফলে, পরে আমি মাইনর পরীক্ষায় গণিতে পূর্ণ নম্বর লাভ করেছিলুম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পূর্ণ নম্বর পেয়ে, গণিতে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করেছিলুম, আর এল, এ পরীক্ষার সময় জেনারেল এসেমব্লি কলেজে পূজনীয় অধ্যাপক গৌরশঙ্কর দে মহাশয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র হয়েছিলুম। এল, এ পরীক্ষায়ও গণিতে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলুম। এখন যদিও অনেক ভুলে গিয়েছি, তবুও মনে আছে, আমি যখন জেনারেল এসেম্‌ব্লি কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন বাড়িতে বসে গণিতশাস্ত্র এত চর্চ্চা করেছিলুম যে, সে সময়ের এম, এ ক্লাসের গণিতের সমস্ত পাঠ্য আমার আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল। এমন কি তার কয়েক বৎসর পরে আমি যখন তথাকথিত সন্ন্যাস অবলম্বন করে লক্ষ্যভ্রষ্ট ধূমকেতুর মত হিমালয়ের কোলের ডেরাডুন সহরে উপস্থিত হয়েছিলুম, তখন সেখানকার Trigonometrical Survey অফিসের প্রধান Computor প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ পণ্ডিত অধুনাপরলোকগত পূজনীয় কালীমোহন ঘোষ মহাশয় আমার গণিত-বিদ্যা পরীক্ষা করে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মনে পড়ে আমার বিদ্যা পরীক্ষার জন্যে তিনি একটা জ্যামিতির প্রশ্ন আমাকে দেন, আমি ক্রমাগত তিনদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ক'রে ও তিন-শ রেখাঙ্কন ক'রে সেই উৎকট প্রশ্নের সমাধান করি।

আমার বাঙ্গলা স্কুলের পড়া আর বেশীদিন আগাল না। প্রথম শ্রেণীতে উঠেই আমার চোখের অসুখ এমন বেড়ে উঠল যে, গ্রামের ডাক্তার আমার পড়াশুনা একেবারে বন্ধ করার হুকুম দিলেন, আর যত শীঘ্র সম্ভব কলকাতায় চিকিৎসার জন্যে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বললেন।

আমার পিশতুতো বড় ভাই স্বর্গীয় বঙ্কুবিহারী ব্রহ্ম কলকাতায় থাকতেন। আমাদেরই গ্রামের নিকট-প্রতিবেশী নবকৃষ্ণ সাহা মহাশয়ের কলকাতায় চাউলের কারবার ছিল, দাদা সেই আড়তের প্রধান গদিয়ান ছিলেন। আমার জেঠতুতো বড় ভাই তার আগের বছরেই গ্রামের ইংরাজী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করে কলিকাতার ফ্রি চার্চ্চ ইনষ্টিটিশনে পড়তে এসেছিলেন। তখন ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেল লাইন কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত গিয়েছিল। আর পদ্মাতীরে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত রেল লাইন করবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গের যাত্রীদের কুষ্টিয়ায় নেমে নৌকো করে যেতে হ'ত। ষ্টীমার যাতায়াত তখনও হয়নি। জ্যাঠামশায় তখন বেঁচে ছিলেন, তিনি আমার পিশতুতো ভাইকে লিখে পাঠালেন। চিঠি পেয়ে বড় দাদা একদিন কলকাতা থেকে এসে আমায় সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। আমি তখন বালক। কলকাতায় গিয়ে সেই বয়সে আড়তে কেমন করে থাকবো, এই বিষয় চিন্তা করে জেঠামশায় আমার পিসিমাকেও সঙ্গে পাঠাবেন, ঠিক করলেন। সেই সময়ে আমাদেরই প্রতিবেশী স্বর্গীয় হরিনাথ মজুমদার সপরিবারে কলকাতায় থাকতেন। স্থির হ'ল যে, তাঁর বাসাতেই গিয়ে উঠ্‌বো। কোন সালের কথা তা আমার মনে নেই। আমরা একদিন বাড়ি থেকে নৌকো করে কুষ্টিয়ায় গিয়ে, সেখানে থেকে রেলে চড়ে কলকাতায় উপস্থিত হলুম। তারপর আমার চিকিৎসা আরম্ভ হ'ল। সে চিকিৎসার সব কথা পূর্ব্বেই বলেছি।

হেকিমের চিকিৎসায় যখন আমার চোখের অসুখ সেরে গেল, তখন আবার লেখাপড়া শেখা আরম্ভ করতে হ'ল। কিন্তু এক মুস্কিলে পড়লুম। দু'তিন বছর আগে পড়াশুনা ছেড়েছিলুম, এখন দেখলুম বাঙ্গালা স্কুলে পড়া আরম্ভ করতে গেলে, আমাকে আবার তৃতীয়

শ্রেণীতে ভর্ত্তি হতে হয়। আমার ছোট ভাই শশধর তখন বাঙ্গলা স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ছিল। আমি বড়দাদাকে বললুম, ছোট ভায়ের সঙ্গে এক ক্লাসে আমি পড়বো না। তিনি মহা ভাবনায় পড়লেন। তখন গোয়ালন্দে আমাদের বাসা ছিল না, বড়দাদাই পরের বাসায় থেকে চাকরী করতেন, সেখানে আমাকে কি রকমে রাখা যায়? শেষে স্থির হ'ল যে, গোয়ালন্দে একটা বাসা করে, বড়-বৌ আর দু' একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে, তাহ'লে আমি গোয়ালন্দে গিয়ে নতুন মাইনর স্কুলে ভর্ত্তি হ'তে পারি। তাতেও আর এক অসুবিধা উপস্থিত হ'ল। তখন আমার ইংরাজি বর্ণপরিচয়ও হয় নি। মাইনর স্কুলে নিম্নশ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়ে, মাইনর পরীক্ষা দিতে গেলে, আমাব বয়স ১৭।১৮ বছর হয়ে যাবে। আমি বড়দাদাকে বললুম, আপনি যদি রোজ সকালে ও সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টা করে ইংরাজি পড়ান, তাহলে আমি দু'মাসের মধ্যে মাইনর স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর উপযুক্ত ইংরাজি ভাষা শিখতে পারবো। বড়দাদা বললেন, সে কি সম্ভব, তোমার অক্ষর পরিচয় হয়নি, আর তুমি দু'মাসের মধ্যে Moral Class Book পড়তে পারবে? আমি বললুম, নিশ্চয় পারবো। তারপর দু'মাসকাল আমি যে ইংরাজি পড়েছিলুম, সে কথা আমার এখনও মনে আছে। ঠিক দু'মাস পরে আমাকে যখন গোয়ালন্দ মাইনর স্কুলে ভর্ত্তি করার জন্যে বড়দাদা নিয়ে গেলেন, তখন স্কুলের হেডমাষ্টার মশায় আমায় ইংরাজি পরীক্ষা করে প্রশংসা করলেন ও আমাকে তৃতীয় শ্রেণীতেই নিলেন।

তিন বছর গোয়ালন্দ স্কুলে পড়ে আমি মাইনর পরীক্ষা দিলুম ও ফরিদপুর জেলার সমস্ত পরীক্ষার্থীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তিলাভ করলুম। সেই পরীক্ষায় আমি আরও একটা পুরস্কার পেয়েছিলুম। রাজবাড়ীর রাজা সূর্য্যকুমার গুহরায়, ঢাকা বিভাগে

মাইনর পরীক্ষায় যে ছাত্র ইতিহাসে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাবে, তাকে তিনি একটী রৌপ্যপদক দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। আমি ইতিহাসে সর্ব্বোচ্চ স্থান পেয়ে সেই পুরস্কার লাভ করেছিলুম। বড়দাদা মনেও করেননি যে আমি এমনভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ব। তিনি স্থির করেছিলেন যে, কোন রকমে মাইনর পাশ করে আমি মোক্তারী পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হ'ব। তখন মাইনর পাশ করলেই মোক্তারী দেওয়া যেতো। সে সময়ে আমাদের যে অবস্থা, তাতে উচ্চ শিক্ষালাভের কল্পনা কারও মনে হয়নি। কিন্তু মাইনর পরীক্ষায় আমার কৃতকার্য্যতা দেখে বড়দাদা তাঁর সে সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন। আমার প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়াই স্থির হ'ল।

পরীক্ষা দেবার আগে ফি দাখিল করবার সময়ে যে ফরম পূরণ করতে হয়, তাতে বৃত্তি পেলে কোন স্কুলে পড়বে, লিখে দিতে হয়। আমাদের হেডমাষ্টার স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বসু মশায় আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই, বৃত্তি পেলে ফরিদপুর জেলা স্কুলে পড়বো, এই লিখে দিয়েছিলেন। আর তিনি যদি জিজ্ঞাসা করতেন, তাহলেও আমি যে কোন স্কুলের কথা লিখে দিতে বলতুম, বলতে পারি না। কারণ আমি যে পরীক্ষায় পাশ হয়ে বৃত্তি পাবো, একথা স্বপ্নেও মনে করিনি। কোন রকমে পরীক্ষায় পাশ হ'য়ে, মোক্তারী পরীক্ষা দেবো, এই আমার স্থির ছিল। সুতরাং যখন বৃত্তি পেলুম, তখন বিষম বিপদ উপস্থিত হ'ল। মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তি নিয়ে ফরিদপুরের মত জায়গায় পড়ার খরচ চালান বড়দাদার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। মাসে আর তিন চার টাকা হ'লে, কোন রকমে ফরিদপুরে পড়া চলতে পারতো। কিন্তু সে তিন চার টাকা দেওয়াও বড়দাদার সাধ্যের বাইরে। আমার সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে আমাদের গ্রামের পরলোকগত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী ফরিদপুরের

ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এই মোহিনীবাবুই পরে রাজকার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ করে কুষ্টিয়ায় 'মোহিনী মিল' স্থাপন করেন এবং সে মিল এখন বাঙ্গালা দেশের প্রতিষ্ঠাপন্ন কাপড়ের কল কয়টীর অন্যতম হয়েছে। প্রথমে মনে করেছিনুম ফরিদপুরে গিয়ে তাঁরই আশ্রয় ভিক্ষা করবো। কিন্তু একটা কারণে প্রথমে তাঁর আশ্রয়ে যাওয়া হ'ল না।

গোয়ালন্দ স্কুল থেকে আমার সঙ্গে একটী ছাত্র মাইনর পাশ করেছিলেন। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন সেন। তিনি বি-এ পাশ করে এখনও গোয়ালন্দেই ওকালতি করছেন। তাঁর বাবা উমেশচন্দ্র সেন তখন গোয়ালন্দের একজন বড় উকিল ছিলেন। তিনি দক্ষিণারঞ্জনকে ফরিদপুরে পড়তে পাঠালেন। দক্ষিণা ফরিদপুরে একটি মেসে বাসা স্থির করলেন আর আমাকে লিখলেন যে, তাঁর বাবা মাসিক তাঁর খরচের জন্যে ১৫৲ টাকা দিবেন ও আমার ৫৲ টাকা, এই ২০৲ টাকায় আমাদের দুই বন্ধুরই ফরিদপুরের পড়ার খরচ চলে যাবে। দক্ষিণারঞ্জনের সেই সাহায্য ও বন্ধুত্বের কথা আমি এই বৃদ্ধ বয়সেও ভুলতে পারিনি। অযাচিতভাবে মোহিনীবাবুর গলগ্রহ হওয়ার চেয়ে বন্ধু দক্ষিণারঞ্জনের সাহায্য লওয়াই আমি শ্রেয়ঃ মনে করেছিলাম।

ফরিদপুরে গিয়ে দক্ষিণারঞ্জনের সেই মেসে উপস্থিত হয়ে দেখলুম, সেটী মেস নয়, ফরিদপুরের কালেক্টরীর এক কেরাণীর বাসা। তিনি কেরাণীগিরিও করেন আবার বাসার যে ঘরখানি রাস্তার দিকে, তাতে একটা মদের দোকানও খুলেছেন। পিছনদিকের তিনখানি ঘরে জনকয়েক ছাত্র আর কয়েকটী অফিসের কেরাণী নিয়ে বাসা বেঁধেছেন। বাসাটা এমন স্থানে যে, সে কথা মনে করলে এখনও হৃদ্‌কম্প হয়। বাসার পেছনেই বড় বেশ্যাপল্লী। একদিকে বেশ্যাপল্লী আর বামহাতেই মদের দোকান, আমার তো দেখেই চক্ষুস্থির! যখন সেখানে উপস্থিত

হয়েছি, তখন হঠাৎ চলেও যেতে পারলুম না। সেখানেই রয়ে গেলুম, আর গভর্ণমেণ্ট স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হলুম। তখন কালিদাস রায় মহাশয় ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। দ্বিতীয় শিক্ষকের নাম আমার মনে নেই, তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন নরেন্দ্র দেব রায়।

কোন রকমে দিন পনের সেই নরকে বাস করে আমি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম। মাতাল আর বেশ্যার গোলমাল অসহ্য হয়ে উঠেছিল। অন্য কোন উপায় না পেয়ে একদিন মোহিনীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি প্রথমে আমাকে চিনতে পারলেন না। কিন্তু যখন আমার পরিচয় দিলুম, তিনি উঠে এসে আমাকে একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। বল্লেন—"তুমি দ্বারীর ভাই, ফরিদপুরে এসেছ কেন?" আমি তখন আমার সমস্ত অবস্থা তাঁকে বল্লুম। তিনি হাঁ হাঁ করে উঠলেন—"আরে সর্ব্বনাশ, বেশ্যাপাড়ার মধ্যে মদের দোকানে বাসা নিয়েচ! যাও, এখনি জিনিষপত্র নিয়ে এখানে চলে এস।" আমি বল্লুম, "এমাসের কটা দিন গেলে হয় না?" তিনি হেসে বল্লেন—"ওঃ বুঝেছি, বাড়ী থেকে টাকা না এলে বুঝি তাদের মেসের খরচা মিটিয়ে দিতে পারবে না বলে আসতে চাচ্ছ না? পনের দিন ত সেখানে আছ, বড় বেশী হয় তো তাদের ৪৲। ৫৲ টাকা পাওনা হয়েচে।" এই কথা বলে তিনি ঘরের মধ্যে চলে গেলেন, আবার মিনিট দুই পরে বাইরে এসে আমার হাতে ১০৲ টাকা গুঁজে দিয়ে বল্লেন—"এই টাকা দিয়ে যার যা দেনা আছে শোধ করে এক ঘণ্টার মধ্যে এখানে চলে আসবে!" আমি একটু ইতস্তত: করে বল্লুম—"আমার কাছে এখনও ৩।৪ টাকা আছে, তাতেই মেসের দেনা শোধ হয়ে যাবে।" তিনি বল্লেন—"বেশ তো, তা তোমার হাতেই থাকুক, এই টাকাটাই খরচ কর না। আজই তোমার দাদাকে চিঠি দিয়ে দাও যে, আজ থেকে তোমার এখানে পড়ার

সমস্ত ভার আমি নিলুম", আমি কি বলবো ভেবে পেলুম না। তাঁকে প্রণাম করে উঠ্‌তেই, তিনি "তুমি সম্বোধন ছেড়ে বল্‌লেন—"দ্যাখ, তোর কোন সঙ্কোচের কারণ নেই। আমি তোর দাদা দ্বারীরও বড় ভাই। আমি তোর সাহায্য করতে বাধ্য। এটা আমার দান নয়, কর্ত্তব্যকার্য্য।" এর ওপর আর কথা বলা চলে না। আমি তাঁকে প্রণাম করে বাসায় চলে এলুম। তখনই মেসের দেনা পাওনা শোধ করে দিয়ে, বন্ধু দক্ষিণারঞ্জনকে সমস্ত কথা বলে, আমার সামান্য ক'খানি বই আর বিছানা নিয়ে মোহিনীবাবুব বাসায উপস্থিত হলুম।

মহতের আশ্রয় পেলুম বটে, কিন্তু এ আশ্রয়ে বেশী দিন থাকতে পারলুম না। মোহিনীবাবু ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। এখন্ হাকিমেরা কি করেন জানি না, কিন্তু সেকালে হাকিমেবা ১২।১টার আগে কেউ কাছারী যেতেন না। বিশেষতঃ মোহিনীবাবু পরমনিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, তাঁর পূজা আহ্নিক শেষ হতেই বেলা ১১টা বেজে যেত। তারপর আহারাদি সেরে তিনি কাছারী যেতেন। তাঁর বাসায় স্কুলের ছাত্র কেউ ছিল না। তাঁর বড ছেলে শ্রীমান্ সত্যপ্রসন্ন তখন ৫।৬ বছরের বালক। সুতরাং মোহিনীবাবুর বাসায় ১০টার মধ্যে আহার করার সুবিধা হ'ত না। আমারও এমন সাহস হ'ত না যে, একটু সকাল সকাল রান্নার জন্যে তাগাদা করি। মোহিনীবাবুর গৃহিণীও সে কথা বুঝতে পারেন নি। কাজেই আহারেব জন্যে অপেক্ষা করলে আমার স্কুলে যাওয়া দেরী হয়ে যেত। এই কারণে মাঝে মাঝে আমাকে অনাহারে স্কুলে যেতে হ'ত।

ঘটনাক্রমে একদিন মোহিনীবাবু এই কথা জানতে পারলেন। শুনলুম, সেদিন আহার করতে বসে তিনি বামুন ঠাকুরকে আমার ওপর দৃষ্টি রাখতে বল্‌লেন। ব্রাহ্মণ অসঙ্কোচে বলে ফেল্‌লে, "সকাল সকাল

তো সব দিন রান্না হয়ে ওঠে না, তারি জন্যে স্কুলের ছেলেটিকে অনেক দিন না খেয়েই স্কুলে যেতে হয়।" এই কথা শুনে মোহিনীবাবু আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, আর অন্ন স্পর্শ করলেন না। অমন যে ধীর শান্ত মানুষ তাঁরও ধৈর্য্যচ্যুতি হ'ল। তিনি চীৎকার করে বল্‌লেন—"এমন অপরাধের প্রতিবিধান না হ'লে, আমি এ বাড়ীতে অন্ন গ্রহণ করবো না।" এই বলে তিনি বাহরে গিয়ে, অভুক্ত অবস্থায় কাছারীতে চলে গেলেন। তাঁর আর দেরী সইল না। তিনি কাছারীতে গিয়েই আমাদের হেডমাষ্টার হরিদাসবাবুকে চিঠি লিখে তাঁর আরদালি পাঠালেন। আর আমাকে তখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ছেড়ে দেবার জন্যে হেডমাষ্টারের অনুমতি চাইলেন। হেডমাষ্টার মশায় আমাকে লাইব্রেরীতে ডেকে নিয়ে বল্‌লেন—"ডেপুটী মোহিনীবাবু এখনি তোমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন, এই আরদালির সঙ্গে এখনই যাও, আজ তোমার ছুটী।" এই কথা শুনে ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল, হঠাৎ আমাকে কেন ডাকিয়ে পাঠালেন কিছুই বুঝতে পারলুম না।

গভর্ণমেণ্ট স্কুল থেকে কাছারী বেশী দূর নয়। আমি এক রকম কাঁপতে কাঁপতে আরদালির অনুসরণ করলুম। আরদালির সঙ্গে এজলাসে ঢুকতেই মোহিনীবাবু বিচার আসন ছেড়ে নেমে এলেন। আমার হাত ধরে নিজের খাস কামরায় নিয়ে গেলেন। মনের আবেগে তখন তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি প্রথমে কিছুই বলতে পারলেন না। তারপর ধীরে বল্‌লেন—"ছাখ জলধর, তুই যে অনেক দিন না খেয়ে স্কুলে আসিস্, এ কথা একদিনও আমায় বলিস্‌নি! এ যে আমার কি অন্যায়, কত অপরাধ হয়েছে, তা তুই ছেলেমানুষ বুঝবিনি। আজই এ কথা আমি শুনচি আর তোরই মত না খেয়ে কাছারীতে এসেচি। তুই কিছু মনে করিসনি, এমন আর কখনও হবে না।"

সেই থেকে যথাসময়ে আমার আহারের ব্যবস্থা হোল। আমি কিন্তু এতে বিশেষ অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলুম। মোহিনীবাবু দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন: তাঁর ওপর এই ভাবে আবদার করা কিছুতেই আমার মনঃপূত হোল না।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, সেটা ইংরাজী ১৮৭৬ সাল। তখন ফরিদপুরে রেল যায় নি। ষ্টিমার ষ্টেশন ছিল কিনা ঠিক মনে নেই। আর থাকলেও, আমার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, ষ্টীমারের ভাড়া দিয়ে মাঝে মাঝে গোয়ালন্দে আসি। বাড়ী যাবার দরকার ছিল না; কারণ, আমার যাঁরা আপনার জন, তাঁরা সকলেই তখন গোয়ালন্দে থাকতেন। দেশের বাড়ীতে আমার পিসীমা আর পিস্তুতো ভায়ের স্ত্রী বাস করতেন। আমি প্রতি শনিবার ফরিদপুর থেকে গোয়ালন্দে আসতুম, আর সোমবারে অতি ভোরে যাত্রা করে যথাসময়ে স্কুলে পৌঁছতুম। তখনকার গোয়ালন্দ ফরিদপুর থেকে ন' ক্রোশ রাস্তা, আমি প্রতি শনিবার স্কুলের পর ১॥ টার সময়ে বাহির হয়ে রাত্রি ৭।৮ মধ্যে অতিক্রম করতুম। পনের বছর বয়েসের এই পথ চলার অভ্যাস, পরের কালে আমার অনেক কাজে লেগে গিয়েছিল।

এক শনিবারে গোয়ালন্দে এসে আমার অসুবিধার কথা জ্যেঠাইমা ও বৌদিদিকে বললুম। বড়দাদাকে কোন কথা বলার সাহস হ'ত না। বৌদিদি বড়দাদাকে সমস্ত কথা বলায়, তিনি আমাকে ডেকে বললেন— "ফরিদপুরে থেকে কাজ নেই, তুমি বাড়ী গিয়ে কুমারখালি স্কুলেই পড়া আরম্ভ কর। বাড়ীতে পিসীমা আছেন, তোমার কোন কষ্ট হবে না। তুমি এইবার ফরিদপুরে গিয়েই তোমার স্কলারশিপ্ কুমারখালিতে ট্রান্সফার করবার আবেদন ক'র, আর তা মঞ্জুর হলেই চলে এসো।"

ফরিদপুরে ৩।৪ মাস থাকার পরই আমি কুমারখালিতে চলে' এলাম।

তখন আমাদের গ্রামের স্কুলের অবস্থা অতি শোচনীয়। পূজনীয় কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয় তখন প্রধান শিক্ষক, প্রসন্নকুমার সান্যাল মহাশয় দ্বিতীয় আর ব্রজনাথ মৈত্রেয় মহাশয় তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন। যখন কুমারখালি স্কুলে ভর্ত্তি হলুম, তখন স্কুলের অবস্থা এত শোচনীয় যে তার আগের পাঁচ বছর একটী ছাত্রও প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হয়নি। স্কুলে গিয়ে দেখলুম যে, সংস্কৃত পড়বার কোনই ব্যবস্থা নেই। বাংলাভাষাতেও প্রবেশিকা দেওয়া যেত, অগত্যা আমি বাংলাই নিলুম। তার ফল যে কি বিষম হয়েছিল, তা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে' হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিলাম। সে যথাসময়ে ব'লব।

কুমারখালির স্কুলের প্রথম দু' বছর যা পড়েছিলাম, সে কথা বলে আমার পূজনীয় পরলোকগত শিক্ষক মশায়দের স্মৃতির অপমান করব না। বল্‌তে গেলে, পড়াই হ'ত না। দ্বিতীয় শ্রেণীতে হেডমাষ্টার মহাশয় মধ্যে মধ্যে এক-আধ ঘণ্টার জন্যে Translation শিখাতে আসতেন, সেইটুকুই যা শিক্ষা। হেডমাষ্টার কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয় সেকালের Senior পাশ ছিলেন। এই সুদীর্ঘ জীবনে অনেক শিক্ষক দেখেছি, কিন্তু আমার মনে হয়, ইংরাজী স্কুলে সে সময়ে তাঁর মত ইংরাজীনবীশ খুব কমই ছিল। তিনি তখন এতই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে, যথাসময়ে স্কুলে আসতে পারতেন না, আর ইংরাজি সাহিত্য যা পড়াতেন, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ করার সাহায্য করত না। তাঁর দৃষ্টি ছিল, ইংরাজি ভাষা ও ইংরাজি লিখন পদ্ধতি শিখাবার দিকেই। তাঁর আদর্শ ছিল, Addision আর Johnson। সুতরাং তাঁর ছাত্রেরা সেকালের ইংরাজি বেশ শিখত, পরীক্ষার পাশ করার শিক্ষা মোটেই পেত না। এই কারণেই তার আগের পাঁচ বছর একটী ছাত্রও পাশ করতে পারে নি।

আমরা যখন প্রথম শ্রেণীতে উঠলাম, সেই সময়ে স্কুলের একটা

পরিবর্ত্তন হ'ল। প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণধন মজুমদার মশায় অবসর গ্রহণ করলেন, আর দ্বিতীয় শিক্ষক প্রসন্নকুমার সান্ন্যাল মশায় কমিটী পরীক্ষা পাশ করে ফরিদপুরে ওকালতি করতে গেলেন। নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষকেরাও অনেকে অবসর গ্রহণ করলেন। তখন প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে এলেন নীললোহিত মুখোপাধ্যায়, আর দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হলেন শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী। এঁরা ৩।৪ মাস শিক্ষকতা করেই চলে গেলেন। নীললোহিতবাবু মুনসেফি নিলেন, শ্রীনাথবাবু কুষ্টিয়া স্কুলের হেড মাষ্টার হলেন। তাঁদের পরিবর্ত্তে হেড মাষ্টার হয়ে এলেন অভয়াচরণ চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় শিক্ষক হয়ে এলেন উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম। অভয়াবাবুর বাড়ী কলকাতার কাছে পানিহাটিতে। তিনি আজন্ম পশ্চিমে ছিলেন ও লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেন। তাঁর পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি দেশে চলে আসেন ও সেই সময় আমাদের স্কুলের হেড মাষ্টারী পদ খালী হওয়ায় তিন বছরের এগ্রিমেণ্টে ১০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হ'ন। অভয়াবাবুর ইংরাজি খুব দুরস্ত ছিল। তিনি যখন ইংরাজি, হিন্দি ও উর্দ্দুতে কথা বলতেন, তখন কেউই তাঁকে বাঙ্গালী বলে মনে করতে পারতেন না। আমাদেরই সৌভাগ্যক্রমে পরীক্ষার ৪।৫ মাস আগে এমন হেড মাষ্টার ও সেকেণ্ড মাষ্টার পেয়েছিলাম। বলতে কি, এই ৪।৫ মাসে তাঁরা যা শিখিয়েছিলেন, তা অন্য কেউ ৪।৫ বছরেও শিখাতে পারতেন না। তাঁদেরই শিক্ষার গুণে পাঁচ বছর পরে কুমারখালি স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্র পাশ হ'ল। আমরা চার জন ছাত্র সেবার পরীক্ষা দিয়েছিলাম, তার মধ্যে যে দু'জন পাশ করি সেই দু'জনই এখনও বেঁচে আছি। একজন শ্রীযুক্ত রাধবল্লভ দে, পাবনার সব জজ আফিসে সেরেস্তাদারি করে অল্পদিন হ'ল অবসর নিয়েছেন।

আর দ্বিতীয় জন আমি। রাধাবল্লভ তৃতীয় বিভাগে আর আমি দ্বিতীয় বিভগে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। সেবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল অতি শোচনীয় হয়েছিল। তা না হ'লে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেও, প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুলের ছাত্র স্বনামপ্রসিদ্ধ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (ডি, এল রায়ের) সঙ্গে ব্রাকেটে ১০৲ টাকা বৃত্তি পেতাম না। কুমারখালি স্কুলের ভাগ্যে ১২ বছর পরে এই বৃত্তি লাভ, আর সে সৌভাগ্য আমারই হয়েছিল।

যে তিন বছর বাড়ীতে ছিলাম, সে সময় আমার অতিকষ্টে দিন কাটাতে হয়েছিল। পিস্‌তুতো ভাই কলকাতায় চাকরী করতেন, এ কথা আগেই বলেছি। বাড়ীতে তখন পিসিমা, পিস্‌তুতো ভাইয়ের স্ত্রী আর তাঁর তিনটি মেয়ে ছিল। এদের খরচের জন্য আমার পিস্‌তুতো ভাই মাসে ১৬৲ করে দিতেন। সেই ১৬৲ টাকা থেকে তাঁর স্ত্রী, আমাদের বড় বৌ, প্রতি মাসে ২।৩ টাকা করে সরিয়ে রাখতেন। সুতরাং সংসার খরচ ১৩।১৪ টাকার মধ্যে কুলাতে হ'ত। সে সময় আমার বড় দাদা বাড়ীতে কোন খরচ পাঠাতেন না, অথচ আমার পিশিমার উপরই সংসার চাপিয়ে দিলেন। অবশ্য খাবার জিনিষ চাল, দাল, ঘি, তেল, ময়দা সবই অতি সস্তা ছিল। আমার বেশ মনে আছে, আমরা ১৷৹ কি ১৷৵৹ মণের মোটা চাল খেতাম। তরিতরকারীও সস্তা ছিল। তা হ'লেও ঐ কটা টাকায় একটা সংসার চলে না। কাজেই আমাদের খাওয়াদাওয়ার অত্যন্ত কষ্ট হ'ত। আমার বেশ মনে আছে, রবিবার ও ছুটীর দিন ছাড়া রোজ স্কুল যাবার সময় মোটা চালের ভাত আর কাঁচকলা ভাতে ছাড়া আর কিছুই

পেতে পাইনি। অনেক দিন আবার তাও জুটত না, অনাহারে স্কুল যেতে হত। চারটার পর স্কুল থেকে ফিরে এসে দুপুরের রান্না ভাত-তরকারী খেতাম। রাত্রিতে রান্নাও হ'ত না, আমিও খেতে পেতাম না। দাদার মেয়েরা ও বড় বৌ দুপুরের রান্না ভাতই সন্ধ্যার আগে খেত। সে সময় অনেক দিন আমার একাহারই হ'ত। আমার এ কষ্টের কথা আমি কোন দিন কাউকেও জানাইনি। মা, জ্যেঠাইমা, আমার বড় দাদার স্ত্রী এঁরা এ কথা শুনলে মনে কষ্ট পাবেন ভেবে আমি নীরবেই সমস্ত সহ্য করতুম।

মাইনর পরীক্ষায় মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তি পেয়েছিলাম, সে টাকারও হিসাব দিচ্ছি। যারা বৃত্তি পায় গভর্ণমেণ্ট স্কুলে তাদের মাইনে দিতে হয় না। আমি ফরিদপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুলে মাইনা দিই ন। গভর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে মাইনা দিতে হয়। কুমারখালি স্কুলের উচ্চ তিন শ্রেণীতে তখন মাসিক ১।০ মাইনা ছিল। আমার বৃত্তি থেকে মাইনার জন্যে ১।০ খরচ হোত। আমার মা, বিধবা বোন ও ছোট ভাই তখন গোয়ালন্দে বড় দাদার কাছে থাকতেন, তাঁদের খরচ বড় দাদাই বহন করিতেন। তা হ'লেও আমি বেশ বুঝতে পারতাম, তাঁদের দু'চার পয়সা কোন কারণে দরকার হোলে বড় দাদা বা বৌদিদির কাছে চাইতে তাঁরা সঙ্কোচ বোধ করতেন। এই কারণে আমি প্রতি মাসে বড় দাদা ও বৌদিদির অজ্ঞাতে মাকে ৩৲ টাকা পাঠিয়ে দিতাম। মা অনেকবার বারণ করেছিলেন, কিন্তু আমি তা শুনিনি। ৫৲ টাকা বৃত্তির ৪।০ টাকার ত হিসাব দিলাম, বাকি রইল ৷৹ আনা। আমার কেমন একটা বদ অভ্যাস ছিল, এবং এখনও আছে যে, সম্পূর্ণ নির্জ্জন না হ'লে আমি লেখাপড়া করতে পারি না। ছাত্রাবস্থায় আমি কোন দিন দিনের

বেলা লেখাপড়া করতাম না। আমার পড়ার সময় ছিল রাত্রিবেলা। আমি রোজ রাত্রি ৮টার পর পড়তে বসতাম, আর ১২।১টা পর্য্যন্ত লেখাপড়া করতাম। কোন কোন দিন এমন তন্ময় হ'য়ে যেতাম যে, কোন দিক দিয়ে যে রাত্রি প্রভাত হ'ত তাও জানতে পারতাম না। সারা রাত্রি পড়তে গেলে আলোর দরকার। আমি আমার সেই ৷৵০ আনা পয়সা তেল কিনেই খরচ করতাম। দু'চার পয়সা যা বাঁচাতাম তা এদিক ওদিক খরচ হয়ে যেত। কাগজ, কলম, পেনসিল বড় দাদা গোয়ালন্দ থেকে মাঝে মাঝে পাঠাতেন, পাঠ্যপুস্তকের অধিকাংশই পরের কাছ থেকে চেয়ে পড়তাম। মনে আছে সহপাঠীরা যে সমস্ত বই ছাড়তে চাইত না, আমি তাদের বাড়ীতে বসে পড়া শেষ করতাম, আর না হয় সমস্ত বইগুলি নকল করে আনতাম।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লাম। অভাবনীয় সৌভাগ্যবলে ১০৲ বৃত্তিও পেলাম। কিন্তু তারপর? বিশ্ববিদ্যালয়েব নিয়ম আছে, প্রবেশিকা পরীক্ষার আবেদন পত্র দাখিল করবার সময় লিখে দিতে হয়, যদি বৃত্তি পাই কোথায় পড়ব। আমার বেশ মনে আছে, আমাদের সেই সময়ের প্রধান শিক্ষক অধুনা পরলোকগত অভয়াচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ওরে, তুই যদি স্কলারসিপ পাস কোথায় পড়বি? সেটা যে এখনি লিখে দিতে হবে!' আমি হেসে বলেছিলাম, যে স্কুলের ছেলেরা ছ' বছর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পরেনি, ১২ বছর কেউ বৃত্তি পায়নি সেই স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে পাস হওয়াই অসম্ভব, তার আবার বৃত্তি!' অভয়বাবু বললেন—'তা বললে কি হবে, ওটা লিখে দেওয়া দস্তর।' আমি বল্লাম, তা হ'লে লিখে দিন Civil Engineering College. আমার তখন গণিত শাস্ত্রের দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল, তাই এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের

কথা মনে হয়েছিল। আমি জানতাম, বৃত্তি আমি পা'ব না। যখন লিখে দিতে হবে, তখন আর ছোট কথা লিখি কেন; তাই এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কথা লিখেছিলাম। এটা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শিবপুরে স্থানান্তরিত হয়নি, ক'লিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। লিখতে হ'ত Presidency College, Callcutta, C. E. Department.

মাসিক ; ১০৲ টাকা বৃত্তি পেয়ে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়া বাতুলের স্বপ্ন, ১০৲ টাকায় যে কলকাতায় থেকে সাধারণ কলেজেই পড়া হয় না। আমাদের গ্রামের অনেক বড় মানুষের কলকাতায় কারবার ছিল, এখনও আছে। কলকাতার হাটখোলায় তাঁদের বড় বড় আড়ত ছিল। আমি গ্রামের অনেক বড়মানুষেরই দ্বারস্থ হলাম, তাঁদের কলকাতার বাড়ীতে থেকে দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্নের প্রার্থনা করলাম। কিন্তু কেহই এই দীন দরিদ্র শিক্ষার্থীর কাতর নিবেদনে কর্ণপাত করলেন না, কেহই একটু স্থান বা দুটি অন্ন দিতে স্বীকার করলেন না। Engineering College Session জুন মাসে আরম্ভ হ'ত। আমার পরীক্ষার ফল ডিসেম্বর মাসেই বাহির হয়েছিল। আমি জুন মাসের প্রতীক্ষায় বাড়ীতেই বসে রইলাম। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশের আশা ত্যাগ করতে পারলাম না। নির্ভর করলাম ভগবানের ওপর।

এই সময় আমার সব ব্যবস্থা উল্টাইয়া গেল। কলিকাতা সিটি কলেজের বর্ত্তমান প্রিন্সিপাল ডক্টর শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় আমাদের গ্রামেরই লোক। তিনি সেই সময় বি-এ পাস ক'রে এম-এ পড়ছিলেন। তিনি আমার বড়দাদার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কি একটা উপলক্ষে হেরম্বদাদা কুমারখালি গিয়েছিলেন। সেখানে আমার বড় দাদার বাড়ীতে ছিলেন। হেরম্বদাদা শুনলেন যে,

আমি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়বার অসাধ্য সাধন করবার জন্য বাড়ীতে বসে আছি। তিনি বড় দাদাকে বুঝালেন যে আমাদের মতন দরিদ্র লোকের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ব্যয়ভার বহন করা একবারেই অসম্ভব। তিনি আমাকে জেনারেল লাইনে প্রবেশ করিয়ে দেবার জন্যে পরামর্শ দিলেন। বললেন, '১০৲ টাকা স্কলারসিপ আছে, আর ৪।৫ টাকা হ'লেই কলকাতার ব্যয় চলে যাবে। এবং কলকাতায় গিয়ে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ধরলে বিনা বেতনে তাঁর কলেজে ভর্ত্তি হ'বার সম্ভাবনা আছে।' বড় দাদাও সেই কথাই বুঝলেন। আমাকে বললেন, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশের চেষ্টা অসাধ্য সাধন। তার চাইতে তুমি আর্ট কলেজেই প্রবেশ কর। আমি যেমন কোরে পারি, যত কষ্টই আমার হোক না কেন, তোকে মাসিক ৪।৫ টাকা দেবো।' তখন আর কি করি, বড় দাদার আদেশ শিরোধার্য্য কো'রে আমি কলকাতায় আসলাম।

পূর্ব্বেই বলেছি, আমাদের গ্রামের অনেক বড় মানুষের কলকাতায় আড়ত আছে। তাঁদের দ্বারস্থ হয়ে যখন দু'বেলা দু'মুঠি অন্নের সংস্থান কলকাতায় করতে পারলাম না, তখন কলকাতায় গিয়ে দু'চার দিনের জন্যেও তাঁদের দ্বারস্থ হ'তে আমার মত দীন দরিদ্রেরও কুণ্ঠা বোধ হো'ল। তাই বাড়ী থেকে বেরুবার পূর্ব্বেই আমার এক পুরাতন বন্ধুর কথা মনে হোল। গোয়ালন্দে আমি তার সঙ্গে পড়েছিলাম, একসঙ্গেই মাইনর পাশ করেছিলাম। তার সহায়তায় নির্ভর করেই ৫৲ টাকা বৃত্তি সম্বল কো'রে ফরিদপুর জেলা স্কুলে পড়তে গিয়েছিলাম। তার নাম দক্ষিণারঞ্জন সেন, তিনি তখনকার গোয়ালন্দের খ্যাতনামা উকিল উমেশচন্দ্র সেনের একমাত্র পুত্র। আমি ফরিদপুর ছেড়ে দেশের স্কুলে চলে এলাম, দক্ষিণা ফরিদপুরেই পড়তে লাগলো। আমি যে বছরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলাম, দক্ষিণাও সেই বছরে ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে

পাশ হয়েছিল এবং কলকাতায় এক মেসে থেকে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসানে (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজে) প্রবেশ করেছিল। কলেজে ভর্ত্তি হয়েই, তিনি আমাকে পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রে তার ঠিকানা ছিল, নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট। বাড়ীটার কথা মনে আছে কিন্তু নম্বর মনে নেই। আমি বাড়ী গিয়ে দক্ষিণাকে লিখলুম, আমি অমুক দিন কলকাতায় যাচ্ছি। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আর পড়া হো'ল না, আমি এল-এ পড়বো। কলকাতায় আমার অন্য পরিচিত থাকলেও, আমি দু'এক দিনের জন্যে তার আতিথ্য গ্রহণ করবো। সে যেন নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসে।

যথাসময়ে শিয়ালদহ ষ্টেশনে নেমে দেখি দক্ষিণা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়বার ইচ্ছা ত্যাগ করেছি, সেজন্য সে খুব ধন্যবাদ করলে। সে রাত্রি তার বাসায় কাটালাম। তার পরেও দু'দিন তার বাসায় পরম যত্নে ও আদরে ছিলাম। এই-খানেই আমার পরম বন্ধু দক্ষিণারঞ্জনের কথা শেষ করতে চাই।

কলেজে প্রবেশ করলাম। বৃত্তি পেয়েছিলাম বলে প্রবেশিকায় ফী দিতে হল না। মাইনেও ছয় টাকার জায়গায় পাঁচ টাকা হল। হাটখোলায় বন্ধুর আড়তে আশ্রয়ও পেলাম। আড়তের হিসাবে আমার বাসা খরচ বলে' মাসিক তিন টাকা দেওয়া স্থির হয়ে গেল। আড়তের কর্ত্তা রামলালবাবু বল্লেন—বুঝলে জলধর, ও তিনটে টাকা আর তোমাকে দিতে হবে না। আমরাই মাসে মাসে জমা ক'রে দেব। অর্থাৎ কাগজপত্তরে খোরাকী দেবার কথা থাকলেও, আমাকে তা' দিতে হবে না—এই ব্যবস্থা হয়ে গেল।

এদিকের ত সব ঠিক হয়ে গেল। গোল বাধ্‌ল পড়াশুনে নিয়ে। ইংরাজি সাহিত্যে যে খান-দুই বই পড়া হচ্ছিল, তা' একটী বন্ধু দিলেন।

সেগুলি তাঁর পড়া হয়ে গিয়েছিল। তিনি তখন বি-এ পড়েন। লজিক ফিলজফি ও হিষ্ট্রি তাও কিনতে হ'ল না। এর ওর কাছ থেকে চেয়ে নিলাম। কিনতে হল—নবীন পণ্ডিতের বিশালকায় রঘুবংশ, আর কার সঙ্কলিত নাম মনে নেই—ভট্টিকাব্য। এই বই দু'খানি দেখেই আমার চক্ষুস্থির। সংস্কৃত সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় এই দুইখানি কাব্য পড়তে হবে কিনা শ্রীজলধর সেনকে—যার দেবনাগরী বর্ণপরিচয় পর্য্যন্ত হয়নি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত উপক্রমণিকার 'গো' শব্দের যে কি 'রূপ', তাও তার চক্ষু বা কর্ণগোচর হয়নি।

কথাটা একটু খুলে বলি। আমাদের গ্রামের স্কুলে সংস্কৃত পড়াবার ব্যবস্থা ছিল না। তখন সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পরীক্ষা দেওয়া যেত। আমাদের পণ্ডিতমহাশয় ছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তিনি খুব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। পৌরহিত্য তাঁহার ব্যবসায় ছিল। যজমানের বাড়ী গিয়ে ক্রিয়া-কলাপের জন্য যতটুকু বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ সংস্কৃত জ্ঞানের প্রয়োজন—তা' তাঁর ছিল। আমাদের গ্রামে ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হওয়ার কিছুদিন পরেই তিনি পণ্ডিত নিযুক্ত হন এবং আমরা যখন প'ড়ি, তখন তিনি খুব বেশী বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। ছাত্রদের সংস্কৃত পড়াবার জন্য যতটুকু জ্ঞানের দরকার, পণ্ডিত মহাশয়েয় তা' ছিল না। তাঁকে স্কুল থেকে সরিয়ে দেবার চিন্তাও কারও মনে হ'ত না, তাঁকে গ্রামের লোকে এতই শ্রদ্ধা করত। পণ্ডিত মহাশয়ের ঘণ্টা ছিল আমাদের বিশ্রামের সময়। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্লাসে এসে চেয়ারে হেলান দিয়ে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে—'ওরে গোল করিস্ নে সব পড়, পড়'—বলে' নিদ্রা দেবীর শরণ নিতেন। আমরা কিন্তু স-জাগই থাকতাম। যেই দেখতাম হেডমাষ্টার মহাশয় আমাদের ক্লাসের দিকে আসছেন, অমনি কেউ না কেউ তাঁর চেয়ারে একটু ঠেলা দিতাম—তাই ছিল হেডমাষ্টার

মহাশয়ের আগমনের সঙ্কেত। পণ্ডিত মহাশয় তাড়াতাড়ি টেবিলের ওপর থেকে পা নামিয়ে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতেন—বানান কর বেটা, তীক্ষ্ণ'।

হেডমাষ্টার মহাশয় ক্লাসে প্রবেশ করে' বলতেন—ঈশ্বর, ওদের ভাল করে বাংলা পড়িও। হরিনাথের (কাঙাল) নাম যেন রক্ষা করতে পারে। পণ্ডিত মহাশয় সোৎসাহে বলতেন—সে খুব পারবে। পণ্ডিত মহাশয় অপেক্ষাও বয়োবৃদ্ধ হেডমাষ্টার মহাশয় পরিদর্শনকার্য্য শেষ করে' চলে যেতেন। এইভাবে ইংরাজি স্কুলে সুদীর্ঘ তিন বৎসর বাংল্যভাষা শিক্ষা করেছিলাম।

তাতে আমার, কিছু ক্ষতি হয়নি। কাঙাল হরিনাথের কৃপায় আমি তখন বাংলা সাহিত্যের রথী মহারথী না হয়ে থাকলেও, বড় রকম জমাদার হয়ে পড়েছিলাম, এবং তারই জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় আমি বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলাম। পূজনীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সেবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষক ছিলেন।

কলেজে প্রবেশ করবার পর একদিন তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম, তিনি হেসে বলেছিলেন—'দূর জলধর, হরিনাথ মজুমদার মশায়ের নামই ডুবিয়েচিস্। বাংলায় ফার্ষ্ট হতে পারিস্ নি। ফার্ষ্ট কে হয়েচে জানিস্? কাদম্বিনী বোস।' ইনিই পরে মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যশস্বিনী চিকিৎসক হয়েছিলেন, এবং সে সময়ের প্রসিদ্ধ স্বদেশসেবক সাহিত্যিক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সহিত তাঁর বিবাহ হয়।

সে কথা থাক। আমি যে কলেজে পড়তে এসে অকূল সমুদ্রে পড়লাম—তারি কথা বলি। কলেজে পড়তে আসবার সময়ে আমার অভিভাবকগণের কারও মনে হ'ল না যে, আমি অসাধ্য সাধন করতে

যাচ্ছি। দেবনাগরি অক্ষর পরিচয় যার নেই, সংস্কৃত ব্যাকারণের প্রথম পৃষ্ঠাও যে পড়েনি, তার হাতে একেবারে উঠল কিনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রঘুবংশ ও ভট্টি।

অভিভাবকেরা হয়ত মনে করেছিলেন, যে ছেলে পাড়াগাঁয়ের একটা এঁদো স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে বৃত্তি পেয়েছে, সে একেবারে চতুর্ভুজ, তার শক্তি অসাধারণ। আমি কলেজে প্রবেশ ক'রে চারিদিক অন্ধকার দেখলাম।

সকল বিষয়েই আমি কাঁচা। সংস্কৃতে ত একেবারে বর্ণজ্ঞানহীন। যা একটু জোর ছিল—গণিতশাস্ত্রে। আমি যখন কলেজে প্রবেশ কবি, তখন ফার্ষ্ট আর্টস কেন, বি-এর গণিতশাস্ত্রও আমার পড়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে তো কুলোবে না বন্ধু! বিশ্ববিদ্যালয় যে মণিহারির দোকান! প্রত্যেক দ্রব্যটী চকচকে ঝক্‌ঝকে করে' রাখা চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি নিয়ম থাক্‌ত—যার যে বিয়য়ে ইচ্ছা, সে শুধু সেই বিষয়েই পবীক্ষা দিতে পারবে, তা' হ'লে এই বৃদ্ধ বযসেও গর্ব্ব কবে' বলতে পারি যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার পর দু-তিন বৎসরের মধ্যেই গণিতে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পেয়ে আমি এম-এ, পাস করতে পাবতুম।

তাতো হ'ল না—আমি সংস্কৃতের অকূল পাথারে ভাসতে ভাসতে এল-এ ফেল করে' নামকাটা সেপাই হযে বেবিয়ে এলাম। চেষ্টার ত্রুটি করিনি। অসাধারণ পরিশ্রম করেছি। এমন কি পরীক্ষার পূর্ব্বে এক একদিন কোন্ দিক দিয়ে রাত কেটে যেত, তা জানতেও পারতাম না। তাবপব থাকি আড়তে। সেই বেলা ন'টার সময় ডাল ভাত, কোনদিন একটু তরকাবি, কোনদিন বা তাও নয়, এই খেয়ে কলেজে ছুটতাম, আর ওদিকে রাত্তির ১২টার আগে আড়তের খাওয়া হ'ত না। এই পরিশ্রম আর এই আহার শরীরে সইবে কেন?

পরীক্ষার দুইদিন পূর্ব্বে জ্বরে পড়লাম, সেই জ্বর-গায়েই ক'দিন পরীক্ষা দিলাম। কি যে লিখলাম—তা, ভগবানই জানেন্। অতি কষ্টে পরীক্ষা শেষ হ'লে, বাড়ী চলে' এলাম। তখন পরীক্ষার ফল বের হ'ল, তখন সংবাদ নিয়ে জানতে পারলাম, আমি সংস্কৃতে তিন নম্বরের জন্য ফেল হয়েছি। রঘুবংশের কাগজে ২৩ নম্বর পেয়েছিলাম। কারণ পরীক্ষক রেভারেণ্ড কে, এম, ব্যানার্জ্জি অনুবাদ বড় ভালবাসতেন। সংস্কৃতে বিদ্যা না থাকলেও, অনুবাদের জোরেই বেশী নম্বর পাওয়া যেত। তাই আমি ২৩ নম্বর পেয়েছিলাম।

আর ভট্টিকাব্যের পরীক্ষক ছিলেন—নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়। তিনি বোধ হয় বিশেষ অনুগ্রহ করে' আমাকে ৭ নম্বর দিয়েছিলেন। দুয়ে জড়িয়ে ৩০ হ'ল। ৩৩ না হলে পাস হয় না। আমি ফেল হলাম।

কলেজে গিয়ে দেখা করতে গণিতের অধ্যাপক খ্যাতনামা গৌরীশঙ্কর দে মহাশয় অনেক দুঃখ করলেন, কারণ গণিতে আমি ভাল ছাত্র ছিলাম। প্রিন্সিপাল হেষ্টি সাহেবও দুঃখ প্রকাশ করে' বললেন, "তুমি আর এক বৎসর পড়, আসছে বার নিশ্চয়ই পাস হবে। তোমাকে কলেজের মাইনে দিতে হবে না।"

আড়তওয়ালারাও আর এক বছর আমার অন্ন সংস্থান ক'রে দিতে চাইলেন। কিন্তু তা' আর হ'ল না।

আমার ছোট ভাই শশধর সেইবারই গ্রামের স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। বড়দাদা ও মেজদাদা উভয়েই প্রস্তাব করলেন যে, আমি আর এক বছর পড়ি। শশধরের আর পড়ে কায নেই। সে নিম্নশ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হোক। তখন প্রবেশিকা পাস করেও ওকালতি পরীক্ষা দেওয়া যেত। শশধরেরও সেই মত হ'ল।

আমি কিছুতেই এ প্রস্তাবে সম্মত হতে পারলাম না। আমার একমাত্র ছোট ভাই—তাকে তিন মাসের রেখে বাবা মারা যান। যেমন করে হোক, তাকে লেখা পড়া শেখাব। বড়দাদা আমাকে অনেক বোঝালেন। আমি তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না।

আমি যেমন তেমন একটা চাকরি নিয়ে শশধরের কলেজে পড়বার ব্যয় চালাব। আমার এই দৃঢ় সঙ্কল্পে কেহই বাধা দিতে পারেন নি। বড়দাদা তখন গোয়ালন্দের ফৌজদারি আদালতের পেস্কার। তারপর তিনি সেখানে হেড-ক্লার্কও হয়েছিলেন। তিনি সেই সময়ে ছয় মাসের ছুটী নিয়ে পাবনায় কি একটা কাজে গিয়েছিলেন। সেইখান থেকেই আমাকে সংবাদ দিলেন যে, গোয়ালন্দ স্কুলের থার্ড মাষ্টারী খালি আছে। তিনি স্কুলের প্রেসিডেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পত্র লিখেছিলেন। প্রেসিডণ্ট আমাকে ২৫৲ টাকা বেতনে থার্ড মাষ্টারীতে নিতে স্বীকার করেছেন।

সে গোয়ালন্দে কৈশোর কাল কাটিয়েছি, যে গোয়ালন্দ স্কুল থেকে সর্ব্বপ্রথম মাইনর পাস করে ৫৲ পাঁচ টাকা বৃত্তি পেয়েছিলাম—সেই স্কুল এণ্ট্রান্স স্কুলে পরিণত হওয়ার বছর ২।৩ পরে আমি সেখানেই মাষ্টার হয়ে গেলাম।

গোয়ালন্দে আমাদের একটা বাড়ী ছিল। সেটা দাদা নিজেই তৈরী করিয়েছিলেন। দাদা পাবনায় চলে' যাওয়ায় সে বাড়ী বন্ধ ছিল। তিনিই ব্যবস্থা করে' পাঠালেন যে, রেজেষ্ট্রী অফিসের হেড-ক্লার্ক ব্রজেন্দ্র নাথ বিশ্বাস মহাশয়ের বাসায় আমি থাকব। দাদার ফিরে আসতে তখনও দুই মাস বিলম্ব ছিল। ব্রজেন্দ্রবাবুর ছোট ভাই লোকনাথ তখন ওখানকার স্কুলের ফোর্থ মাষ্টার।

আমি গোয়ালন্দে গিয়ে ব্রজেনবাবুর বাসায় উঠলাম। তখন স্কুলের

হেড মাষ্টার ছিলেন—অধুনা পরলোকগত মদনমোহন সরকার মহাশয়। তিনি মাইনর স্কুলেরও হেড মাষ্টার ছিলেন। আমি তাঁর কাছ থেকেই মাইনর পাশ করি।

স্কুল এণ্ট্রান্সে পরিণত হওয়ার পর তিনিই হেডমাষ্টার হন। তখন আর কি! ম্যাট্‌সিনি-গ্যারিবল্ডি আকাশ-কুসুমের মত আকাশেই মিলিয়ে গেল। 'হেন করব—তেন করব—স্বদেশের সেবা করব—বাংলা সাহিত্যের সেবায় জীবন অতিবাহিত করব। কাঙাল হরিনাথের উপযুক্ত শিষ্য হবার জন্য প্রাণপাত করব। চিরকুমার জীবন অতিবাহিত করব।' ইত্যাদি কত সঙ্কল্প মনে মনে ছিল। এল-এ ফেল করে সব আশা-আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আমি পাড়াগাঁয়ের এক স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক হলাম। মনকে সান্ত্বনা দিলাম—কঠোর কর্ত্তব্যের কাছে আমি আত্মনিবেদন করলাম। নইলে আমার ছোট ভাইয়ের লেখাপড়া শিখবার কোন পন্থাই আর ছিল না। বড়দাদা, মেজদাদার সামান্য আয়ে সংসার চলাই কঠিন ছিল।

সেকালে—আর সেকাল বলি কেন? এখনও—ফৌজদারী পেস্কার মহাশয়দের যথেষ্ট 'উপরি' প্রাপ্তি ছিল। দাদা যদি তা' নিতেন, তা'হলে ছোট ভাইয়েরও পড়া চলত, আমার পড়ার ব্যাঘাত হত না। কিন্তু তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম মানুষ; কোনদিন একটি পয়সাও 'উপরি,-গ্রহণ করেন নি। ৪০৲ বেতন—আর মেজদাদার ১৫৲—এতে সংসার চলাই ভার—পড়ার খরচ কোথা থেকে আসবে? আমি বৃত্তি পেয়েছিলাম—তাইতে দু' বছর আমার পড়া হয়েছিল। এ অবস্থায় আমার চাকরি গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। আর সে চাকরিও মাষ্টারী—একেবারে 'রেডিমেড'। তার জন্য শিক্ষানবিশীও করতে হয় না—কিছুই করতে হয় না। স্কুলে গিয়ে চেয়ারে বসলেই মাষ্টারী হয়। তাইতেই তো আমাদের দেশে শিক্ষার এমন দুরবস্থা।

মাস দুই পরে দাদা ফিরে এলেন। আমি আমাদের বাসায় গেলাম। মাসে পঁচিশটি টাকা পাই—অবশ্য এক আনা কম—সেটা রসীদ ষ্ট্যাম্পের দাম। টাকা কয়টি এনে বড় বৌদিদির হাতে দিই। তিনি শশধরের কলিকাতায় পড়াবার খরচ পাঠান। আমি নিশ্চিন্ত মনে খাই-দাই ছেলে পড়াই। আর পূর্ব্ব-সংস্কার-বশে একটু-আধটু স্বদেশীও করি, বক্তৃতাও করি—গোয়ালন্দে যাঁরা নেতৃস্থানীয়, তাঁদের সমস্ত অনুষ্ঠানের পেছনেও থাকি।

সেই সময় গোয়ালন্দে যিনি ফৌজদারী হাকিম ছিলেন, তিনি জাতিতে পার্শী—সিভিল সার্ভিস পাস করা। তাঁর নাম মিঃ কে, জে, বাদ্‌শা। বৎসরখানেক পূর্ব্বে বাংলা দেশে এসে কিছুদিন আলিপুরের সদরে শিক্ষানবিশী করেছিলেন। তার পরই গোয়ালন্দ মহকুমার ভার পান। লোকটি বড় ভাল এবং তিনি আমাদের স্কুলকমিটির প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। সেই উপলক্ষেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। নইলে সাধারণ স্কুল মাষ্টার আমি—হাকিমদের কাছে মোটেই ঘেঁষতাম না।

একদিন বাদ্‌শা সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন যে, তিনি 'হাই-প্রফিসিয়েন্সী ইন্ বেঙ্গলী' পরীক্ষা দেবেন। তা' নইলে তাঁর পদোন্নতি হতে দেরী হবে। পরীক্ষার ছয় মাস দেরী আছে। এই ছয় মাসের মধ্যে তাঁকে বাংলা ভাষায় লায়েক করে' দিতে হবে। তখন তাঁর বাংলায় বিদ্যা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় ভাগ পর্য্যন্ত।

তিনি আমাকে মাসিক ৩০৲ টাকা দিতে চাইলেন। এ যেন খাজনার চাইতে বাজনা বেশী হ'ল। স্কুলের ৫ ঘণ্টা পরিশ্রম করে' ২৪৸৵০ পাই, আর এ রবিবার বাদে ৬ দিন প্রাতঃকালে এক ঘণ্টা করে সাহেবের বাংলায় হাজিরা দিতে হবে—যেদিন তাঁর কাজকর্ম্মের চাপ থাকবে না সেই দিন তাঁকে পড়ার সাহায্য করতে হবে। ঐ শ্রেণীর

কাঙ্গাল হরিনাথ
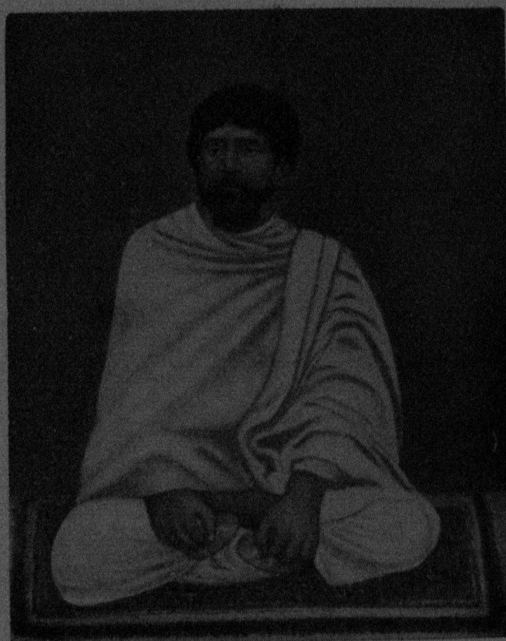
(ফকির ফিকিরচাঁদ)
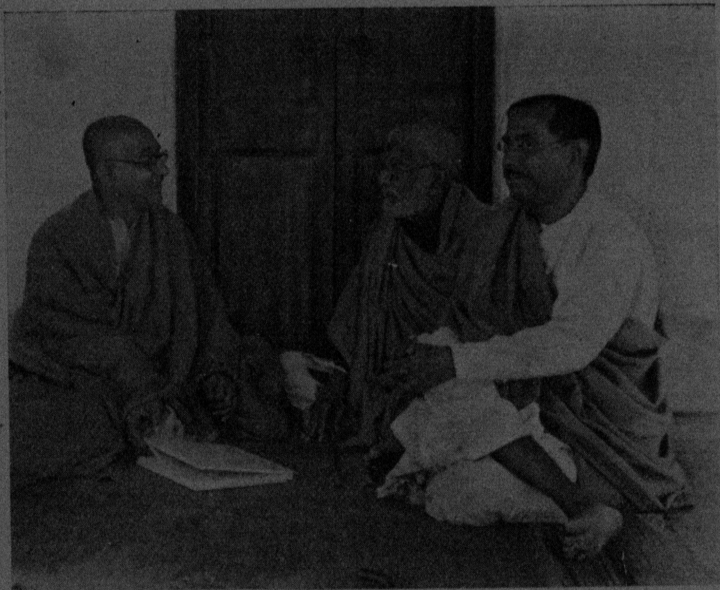
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রমে

স্বামী নির্ব্বেদানন্দ **শ্রীজলধর সেন** শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

(পৌষ ১৩৪৪)

শিক্ষিত লোকের শিক্ষকতা করবার ধরণ আলাদা। আমি তাঁকে কি করতে হবে, তাই ব'লে আসতাম। ইংরাজী থেকে যেটাকে বাংলা করতে হবে বা বাংলা থেকে যেটাকে ইংরাজী করতে হবে, তাই দেখিয়ে দিয়ে আসতাম। আর যে সব পাঠ্য পুস্তক ছিল, প্রতি দিন তার অংশ বিশেষ পড়তে বলে' আসতাম। সাহেব ঠিক ঠিক তাই করতেন। পাঠ্য পুস্তকের যে কথার মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারতেন না, সেইটুকু মাত্র জিজ্ঞেস করতেন এবং যা অনুবাদ করতেন তা সংশোধন করে দিতে হ'ত। অর্থাৎ তাঁকে নিয়ে ঘণ্টা খানেক বক্ বক্ করতে মোটেই হ'ত না।

এমনও হ'ত যে, তিনি ৪।৫ দিনের জন্য মফঃস্বলে চলে' গেলেন— আমার তখন ছুটী। মাইনে কিন্তু বরাবর দিতেন।

ছয় মাসের মধ্যেই সাহেবকে বাংলা ভাষায় লায়েক করে' পরীক্ষা দিতে পাঠালাম। তিনি ফিরে এসে বল্লেন—'Sen, did very well.' আমি তাঁর বিদ্যা পরীক্ষা করবার জন্যে প্রশ্নপত্রের একটা বাংলার কি অনুবাদ করেছেন জিজ্ঞাসা করলাম। সেই বাংলাটা—'তদন্তে জানিতে পারিলাম ঘটনা সত্য।'

সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম—এটার তিনি কি অনুবাদ করেছেন। তিনি বল্লেন—এ আর শক্ত কি—'After that I came to know that the case was true.'

আমি হেসে উঠলাম। তিনি বল্লেন, 'কেন? ঠিক হয়নি!' আমি বল্লাম—'মোটেই না। 'তদন্ত' কথার অর্থই তুমি বুঝতে পার নি। 'তদন্ত'র ইংরেজী হচ্ছে—Investigation.' সাহেব লাফিয়ে উঠে বল্লেন— 'তা কি করে হবে? তুমিই ত বার বার ব'লে দিইছিলে—যে শব্দের অর্থ না বুঝবে—তার সন্ধিবিচ্ছেদ করতে হবে। তোমার কথা অনুসারে

'তদন্ত' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করে আমি পেলাম তৎ+অন্তে অর্থাৎ after that. আর এই লিখিছি। ওটা 'তদন্ত', তা কি করে বুঝব ?

এই বিছে নিয়ে ত সাহেব পরীক্ষা দিয়ে এলেন। মাস দেড়েক পরেই পরীক্ষার ফল বের হ'ল। সাহেব আমাকে ডেকে গেজেট দেখিয়ে বল্লেন—'এই দেখ আমি পাস হয়েছি। আর হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছি। তবে দুঃখের কথা এই যে, ঐ গেজেটেই আমাকে ট্রান্‌সফার করেছে। যাক্, ও টাকা আমি কি করব? আমার বাপের যথেষ্ট টাকা আছে। ঐ হাজার টাকার ৫০০৲ টাকা তোমাকে পুরস্কার দিলাম মাষ্টার, আর ৫০০৲ টাকা এখানকার পাবলিক লাইব্রেরীতে দিয়ে যাব। যা' হোক, ছয় মাস তিরিশ টাকা করে' পেয়েছি—তারপর ৫০০৲ টাকা। এ সব টাকা এনে বড় বৌদিদির নামে সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা করে' দিয়েছিলাম। বলেছিলাম—এর এক পয়সাও কেউ খরচ করতে পারবেন না। ঐ টাকা দিয়ে বড়দার মেয়ের বিয়ে দেব। বৌদিদি বল্লেন—বেশ, তাই হবে।

এ হেন উপযুক্ত ও রোজগেরে ছেলেকে আর অবিবাহিত রাখা যায় না, জেঠাই মা, দু' একবার বলেছিলেন, কিন্তু তাঁদের আমল দিইনি। শেষে তাঁরা একেবারে হাইকোর্টে আপিল করে' বসলেন। এ হাইকোর্ট হলেন—কাঙাল হরিনাথ। এ আপিলে তিনি রায় দিলেন—আমাকে বিবাহ করতেই হবে।

এর প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে একেবারে অসাধ্য। তিনি যা' আদেশ করবেন, বিনা বিচারে অবনত মস্তকে সেই আদেশ পালন করতেই এতকাল শিখেছি। সুতরাং নাকি সুরে একথা বলতে হয়নি—কি করব, মা ছাড়লেন না! এক্ষেত্রে সে কথা বলার যো নেই। আমি

যাঁকে দেবতার মত ভক্তি করি, মাও যাঁকে তেমনি ভক্তি করেন—তাঁরই আদেশ—বিবাহ করতেই হবে।

বড়দাদা মেয়ে খুঁজতে আরম্ভ করলেন। চারিদিকে অনুসন্ধান করে তিনি নিজে গিয়ে মেয়ে দেখে এলেন। বাড়ী এসে সকলকে বল্লেন—পরমাসুন্দরী মেয়ে। আমাদের কায়েতের ঘরে হাজারে একটা মেলে কিনা সন্দেহ। খুব বড় বংশের মেয়ে। মহাকুলীন। কিন্তু মেয়ের বাপের অবস্থা এতই মলিন হয়েছে যে, তিনি অলঙ্কারপত্র বা দানসামগ্রী কিছুই দিতে পারবেন না। অতি কষ্টে শাঁখাশাড়ী দিয়ে মেয়ে দান করবেন। এবং সেই উপলক্ষে যাঁরা পায়ের ধূলো দেবেন তাঁদের যথা-সাধ্য অভ্যর্থনা করবেন।

বড়দাদা একেবারে পাকা কথা দিয়ে এসেছেন। তিনি কিছুই নেবেন না। তবে বরযাত্রী শতাধিকের কম হবে না। আমার শ্বশুর মহাশয় বলেছিলেন, তাই হবে। যে করে পারি তাঁদের অভ্যর্থনা করব। তাঁর নাম অম্বিকাচরণ মিত্র। নদীয়া জেলার—মহামহিম মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন, রঘুনন্দন মিত্র। মহারাজের আদেশে এখন যে ষ্টেশনের নাম শিবনিবাস—তারই নিকটে চারিদিকে গড়খাই বা বেড় দিয়ে দেওয়ান রঘুনন্দন নূতন গ্রাম পত্তন করলেন—ব্রাহ্মণ কায়স্থ অন্যান্য জাতিরও লোকজন এনে গ্রামে বাস করালেন। গ্রামের নাম হ'ল—'দেওয়ানের বেড়'। সেই দেওয়ান রঘুনন্দনের প্র-পৌত্রী সুকুমারী দাসী হবেন আমার গৃহলক্ষ্মী—এই আমার বড়দাদা স্থির করে এলেন। কাঙাল শুনে বল্লেন—বেশ করেছ দ্বারকানাথ। খুব উচ্চ বংশের অবস্থা অত্যন্ত মলিন হয়ে গেলেও সে ঘরের মেয়েরা খুব ভাল হয়। তারা একেবারে মাটিরও অধম হয়ে থাকে।

এই স্থানে রঘুনন্দন মিত্র মহাশয়ের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই। তিনি

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। পদ যে খুব উচ্চ ছিল তা নয়, কিন্তু এই কায়স্থ সন্তানের কর্ম্মকুশলতা ও কার্য্যতৎপরতা গুণগ্রাহী মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি রঘুনন্দনকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতেন। সেই সময় নদীয়া-রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। মহারাজ ঋণভারে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি এই ঋণ শোধ ও রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দূর করবার জন্যে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তখন একদিন রঘুনন্দন মহারাজকে বলেন—মহারাজ, যদি আমার ওপর রাজ্যের সমস্ত ভার অর্পণ করেন তা হলে আমি কিছুদিনের মধ্যেই আপনার সমস্ত ঋণ শোধ করে দিতে পারি এবং রাজ্যের আয় বৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা-সাধন করতে পারি।

রঘুনন্দনের এই কথা শুনে মহারাজ বড়ই প্রীত হলেন এবং তাঁকে দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করে রাজ্যের সমস্ত ভার তাঁর উপর অর্পণ করলেন। রঘুনন্দন তখন নানা উপায়ে রাজ্যের আয় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করে দিলেন, আর এদিকে অযথা-ব্যয় সঙ্কোচ করলেন। এই ব্যয় সঙ্কোচ উপলক্ষে তিনি রাজকুমার, রাজমাতা এবং রাজ-আত্মীয়গণকে রেহাই দিলেন না। এই কারণে অনেকেই তাঁর শত্রু হয়ে উঠল এবং রাজকুমার থেকে আরম্ভ করে অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তাঁর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। মহারাজের কানেও নানা কথা তুলতে লাগলেন। কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত করলেন না। কাজেই সকলকে নিরস্ত হতে হল।

তারপর দেওয়ান রঘুনন্দনের অদৃষ্টে যে শোচনীয় ও অভাবনীয় ব্যাপার সঙ্ঘটীত হল তার বিবরণ দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় প্রণীত ‘ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত’ হ’তে উদ্ধৃত করে দিলাম :

"একদা মুরশিদাবাদে নবাবের সভায় বর্দ্ধমান ও রাজসাহী প্রভৃতি নানা প্রদেশীয় রাজা দিগের দেওয়ান; উকীল এবং অন্য অন্য অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসীন আছেন, এমত সময়ে, রঘুনন্দন ঐ স্থানে উপনীত হইলেন। সভা মধ্যে শূন্য স্থান অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। একারণ, তন্মধ্যে প্রবেশ কালে তাঁহার পরিচ্ছদের নিম্নদেশ বর্দ্ধমানাধিপতির দেওয়ান মাণিকচাঁদের অঙ্গে লাগিল। ইহাতে মাণিকচাঁদ অতিশয় কোপপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে হিন্দি ভাষায় কহিলেন, "দেখ্‌তে নেহিঁ পাজি।" রঘুনন্দন বলিলেন, "হাঁ নওকর সবহি পাজি হ্যায়, কোই ছোটা কোই বড়া।" এই কৌতুকাবহ ও সমুচিত উত্তর শ্রবণে সভাস্থ যাবতীয় ব্যক্তি উচ্চৈঃ-স্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। এইরূপ উপহাসিত হওয়াতে তদবধি তাঁহার সহিত মাণিকচাঁদের বিষম বৈরানুবন্ধন ঘটিল। কিয়ৎকাল পরে মাণিকচাঁদ নবাবের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইলেন। ঐ পদে নিযুক্ত হইবামাত্র বৈরনির্য্যাতনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎকালে এরূপ উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি রঘুনন্দন সদৃশ লোকের অনিষ্ট সাধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে, কোন না কোন ছল করিয়া অনায়াসে সফলযত্ন ও পূর্ণমনোরথ হইতে পারিতেন। বর্দ্ধমানের রাজার কয়েক লক্ষ টাকা রাজস্ব হুগলি হইতে মুরশিদাবাদে প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ টাকা রাজা কৃষ্ণ চন্দ্রের জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত পলাশী গ্রামে পেঁহুছিলে রাত্রিযোগে বহুসংখ্যক দস্যু আসিয়া প্রহরীগণের মধ্যে কাহাকে হত কাহাকে আহত ও পরাভূত করিয়া সমস্ত ধন হরণ করে। কৃষ্ণচন্দ্রের কর্ম্মচারিগণ অপরিমেয় চেষ্টা পাইয়াও হৃতধনের বা অপহারিগণের কোন অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কৃষ্ণচন্দ্রের ষড়যন্ত্রে অথবা তাঁহার শাসন দোষে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া রায় মাণিকচাঁদ তাঁহার প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ রঘুনন্দনকে অপরাধগ্রস্ত করিলেন, এবং প্রথমে তাঁহাকে সমধিক অবমাননা করিয়া, পরিশেষে কামানের দ্বারা উড়াইয়া দিলেন। রাজবাটিতে অতিদুঃখাবহ এই এক প্রবাদ আছে যে, রঘুনন্দন ইতিপূর্ব্বে নিতান্ত প্রয়োজন বশতঃ রাজকুমারদের সঙ্গে যে আপাতঃ কঠিন আচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ বিষয় স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার এই দুর্দ্দশায় দুঃখিত-চিত্ত না হইয়া বরং পুলকিত হইয়াছিলেন। একারণ যখন মুরশিদাবাদে রঘুনন্দনকে গর্দ্দভারোহিত করিয়া নবাবের লোকেরা নগর ভ্রমণ করায়, তখন তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের বাসস্থানের সমীপস্থ বর্ত্মে সমাগত হইলে, রাজপুত্র শিবচন্দ্র তাঁহার প্রতি নয়ন-পাত করিয়া ঈষৎ হাস্য করেন। তদ্দর্শনে রঘুনন্দন অতীব ব্যথিত হৃদয় হইয়া তাঁহাকে কহিলেন যে, "এই অবমাননাতে আমার যাদৃশ যন্ত্রণা বোধ হইতেছে, তাহার সহস্রগুণ তোমাদের ব্যবহারে হইল। অবোধ রাজনন্দন, আমার এই অবমাননাতে কাহার অবমাননা

হইতেছে, ইহা যে তুমি বুঝিলে না, এই বড় পরিতাপের বিষয়। আমি যে গর্দ্দভে আরোহণ করি নাই, তোমার পিতাই করিয়াছেন জানিবে।"

* * * * *

আমার শ্বশুরের নাম অম্বিকাচরণ মিত্র। সে সময় দেওয়ানের বেড়ের অবস্থা অতি শোচনীয় হয়েছিল। বড় বড় অট্টালিকার অস্তিত্ব একেবারে ইষ্টকস্তূপে পরিণত। পূজা-বাড়ীতে প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপই সুধু অক্ষত শরীরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার সম্মুখের বৃহৎ নাটমণ্ডপ স্থানে স্থানে ভেঙ্গে পড়েছিল, তা হলেও ইট-কাটগুলো সরিয়ে সেখানে বসবার জায়গা হতে পারত। অন্দর মহলে সেই ইষ্টক স্তূপের পার্শ্বে খান চারেক একতলা ঘর ছিল। সেইগুলি কোনরকমে সংস্কার করে আমর শ্বশুর মহাশয় বাস করতেন। শ্বাশুড়ী ছিলেন অন্ধ। শ্বশুর মহাশয়ের এক দূরসম্পর্কীয় বিধবা ভগ্নী তাঁদের তত্ত্বধান করতেন।

শ্বশুর মহাশয়ের তিন কন্যা এবং এক পুত্র। পুত্রটীই সর্ব্বকনিষ্ঠ। তার নাম অন্নদাচরণ। তিন কন্যার মধ্যে আমার স্ত্রী সর্ব্বকনিষ্ঠা। বড় দুই জনের বেশ ভাল ঘরে বিবাহ হয়েছিল। আমার বড় ভায়রাভাই স্কুলের সাবইনস্‌পেক্টার ছিলেন। মেজ ছিলেন গোয়ালন্দ ই. বি. আর-এ গুডস্ অফিসে বড়বাবু। এঁরই অবস্থা ভাল ছিল। তিনি যদিও ৬০্ টাকা বেতন পেতেন কিন্তু তাঁর উপার্জ্জন ছিল ছয় সাতশো টাকা।

আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বড় শ্যালিকার একটি মাত্র পুত্র। পরে আর সন্তানাদি হয়নি। মেজ শ্যালিকার তখনও সন্তানদি হয়নি। আমার বিবাহের ৫।৬ বৎসর পরে তাঁর একটী পুত্র হয়।

এইবার আমার বিবাহের কথা। বড়দাদা তো মেয়ে দেখতে গিয়েই আশীর্ব্বাদ করে আসেন। তার কয়েকদিন পরেই এক শনিবারে আমার শ্বশুর মহাশয় স্বয়ং আমাকে আশীর্ব্বাদ করতে এলেন। পূর্ব্বে

সংবাদ পেয়ে বড়দাদা শুক্রবার রাত্রেই বাড়ী এসেছিলেন। আমি কিন্তু তাঁর সঙ্গে আসিনি। রবিবারে আশীর্ব্বাদ হবে,—দু'দিন আগে স্কুল কামাই করে বসে থাকি কেন? বিশেষ সে সময় আমার আ-বাল্য বন্ধু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বাড়ীতে ছিলেন। বড়দাদা ও অক্ষয় ষ্টেশন থেকে আমার শ্বশুর মহাশয়কে অভ্যর্থনা করে এনেছিলেন। কোন বিষয়েই ক্রটি হয়নি।

অক্ষয় আমার শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে খুব ঘনিষ্টতা জমিয়ে তোলে। পরে শুনেছিলাম, অক্ষয় বলেছিলেন—ছেলে আর কি দেখবেন, আমাকে দেখলেই তাকে দেখা হবে। এই আমারই মত রোগা, আমারই মত কালো, আমারই মত লম্বা চুল, আর আমারই মত অল্প অল্প দাড়ী। বিদ্যাসাধ্যি দুই জনেরই সমান। আপনি যদি ইচ্ছা করেন তো আমাকেই আশীর্ব্বাদ করে যেতে পারেন।

আমি রাত্তির ১১টার সময় বাড়ী এলাম। আমার শ্বশুর মহাশয় তখন আহারাদি শেষ করে নিদ্রিত হয়েছেন। শুনলাম, কাঙাল হরিনাথ এসে তাঁকে আপ্যায়িত করে গিয়েছেন এবং আমার গুণগানও করেছেন। প্রাতঃকালে পাড়ার ২।৪ জন এলেন। অক্ষয় তো ছিলেনই।

আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল। শ্বশুর মহাশয় তখন অক্ষয়কে সঙ্গে করে গ্রামের অনেকের বাড়ী গেলেন এবং সকলেই তাঁর বাড়ীতে পদধূলি দেবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলেন। কাঙাল যে কোথাও যেতেন না—তিনি পর্য্যন্ত যেতে সম্মত হলেন। বাড়ীতে এসে অক্ষয় বল্লেন—'আপনি তো নারদের নিমন্ত্রণ করে এলেন, এদিকে বড়দার কাছে শুনেছি—আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় কোন প্রকার সমারোহ করা সম্ভবপর হবে না।'

তিনি বল্লেন—অক্ষয়কুমার, আমার বড় আদরের কন্যা। দেওয়ান

রঘুনন্দনের সম্মান অবশ্য রক্ষা করতে পারব না ; কিন্তু যে একশো-দেড়শো বরযাত্রী যাবেন যথাসাধ্য তাঁদের অভ্যর্থনা করব—এ ভরসা আমার হয়েছে। কারণ, আমার দ্বিতীয় কন্যা বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা করবার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবেন। আমি কেবল কোন রকমে কন্যা সম্প্রদান করব। হয়েছিলও তাই। আমরা প্রায় দেড়শো বরযাত্রী গিয়েছিলাম। সেই জীর্ণ নাটমণ্ডপ পরিষ্কার করে সকলের বাসের ব্যবস্থা আর সেই প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপে আহারের স্থান হয়েছিল। বরযাত্রীদের হাঙ্গামা তাঁদের বেশী পোহাতে হয়নি। তিনটের গাড়ীতে আমরা পৌছি। গোধূলি লগ্নে বিবাহ। রাত্রি ১০টার মধ্যেই আহারাদি শেষ করে ১২টায় গোয়ালন্দ-মেলে বরযাত্রীরা সব ফিরে আসেন।

অভ্যর্থনার কোন ত্রুটী হয়নি এবং ভোজের আয়োজনও দেওয়ান বাড়ীর উপযুক্ত হয়েছিল। শ্বশুর মহাশয় কিন্তু ৫টি হরতকী দিয়েই কন্যা উৎসর্গ করেছিলেন।

কাঙাল সে রাত্রি সেখানেই ছিলেন। পরদিন আমাদের নিয়ে বাড়ী এলেন।

এ বিবাহে বড়দাদাও অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করেন। আমার জ্যাঠাইমা দুইগাছি সোনার বালা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেন। সেই দুই গাছি বালা ব্যতীত বিবাহিত জীবনে তার অঙ্গে আর সোনা ওঠেনি। কোন বিলাস দ্রব্য তার আড়াই বৎসর বিবাহিত জীবনে সে পায়নি। মোটা ভাত মোটা কাপড়েই সে সন্তুষ্ট ছিল। তার সম্বন্ধে একই কথা বলতে পারি যে, সে সমস্ত পৃথিবীটাকে হেসেই উড়িয়ে দিতে পারত। তিরস্কার করলেও হাসি, কারণে অকারণেও হাসি। কোনপ্রকার অভাবকেই সে জীবনে আমল দেয়নি। সবই সে হেসে উড়িয়ে দিত।

এই হাসি সঙ্গে করেই সে এসেছিল—কিন্তু যাবার সময় সে হাসিমুখে যেতে পারেনি। সে কথা পরে বলব।

এখন আমার গোয়ালন্দের মাষ্টারী-জীবনের দুই চারিটি ঘটনার কথা বলি। সেখানে আমি প্রায় ৫ বৎসর ছিলাম। সে সময়ে আমার ন্যায় সামান্য স্কুল-মাষ্টারের জীবনে এমন কিছুই ঘটতে পারে না, যা' উল্লেখযোগ্য। অবশ্য গোয়ালন্দের চাকুরি শেষ হবার সময়ে আমার জীবনধারা আমূল পরিবর্ত্তিত হয়—সে কথা পরে বলব!

সে ইংরাজী ১৮৮৭ অব্দের কথা। মাষ্টারী করা ছাড়া তখন আমার উপায়ান্তর ছিল না। একটু রয়ে-বসে চেষ্টাচরিত্র করলে, কিছুদিন কোন সরকারী আফিসে ঘরের খেয়ে শিক্ষানবিশী করলে হয় ত কোন একটা ভাল চাকুরী জুটতে পারত। কিন্তু তখন আমি এমনই বিপন্ন, আমার তখন অর্থের এমন প্রয়োজন হয়েছিল যে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এল-এ ফেল করে' তার পর বৎসরই আমাকে চাকুরীতে প্রবিষ্ট হ'তে হয়েছিল। যে বৎসর আমি এল-এ ফেল করলাম, সেই বৎসরই আমার একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদর শশধর আমাদের গ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। আমি বৃত্তি পেয়েছিলাম, তাই দু' বৎসর কলেজে পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার ভাই শশধর বৃত্তি পান নাই। তাঁরই পড়াবার খরচ সংগ্রহের জন্য আমাকে মাষ্টারী চাকুরী গ্রহণ করতে হয়েছিল। আমার ছোট ভাই শশধর খুব বুদ্ধিমান্ ছিলেন। কেন যে তিনি ভালভাবে পাস করতে পারলেন না, তা' আমি বুঝতে পারলাম না।

আমরা দুই ভাই, শশধর আমার আড়াই বছরের ছোট ছিলেন। তাঁর বয়স যখন ছয় মাস, তখন আমরা পিতৃহীন হই, বড় হয়ে তিনি আমাকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই বলে' যে শ্রদ্ধা করতেন তা' নয়, আমাকে

তিনি তাঁর জীবনের অবলম্বন বলে'ই মনে করতেন। তাই আমি যখন ফেল হলাম, আর তিনি পাস হলেন, তখন তিনি জেদ করতে লাগলেন যে, আমি আর এক বৎসর পড়ি। তিনি পড়াশুনা ত্যাগ ক'রে পনর কুড়ি টাকার একটা মাষ্টারী কি অন্য চাকুরী নিয়ে আমার পড়ার খরচ চালাবেন এবং নিজেও ঘরে পড়াশুনা করে' মোক্তারী পরীক্ষা দিবেন। পিতৃহীন একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতার এ প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারি নি—আমি যে তার দাদা—সে যে আমার বড় আদরের পিতৃহীন ছোট ভাই! আমাদের সংসারের কর্ত্তা. আমাদের বড় দাদা শশধরের এই প্রস্তাব অনুমোদ করলেন; কিন্তু আমি আমার পরম পূজনীয় বডদাদার আদেশ অমান্য করেছিলাম।

তখন বড়দাদা গোয়ালন্দের ফৌজদারী আদালতের পেস্কার ছিলেন, পরে হেড-ক্লার্ক হন। তিনি চেষ্টা করে' আমাকে গোয়ালন্দ স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক-পদে নিযুক্ত করিয়ে দিলেন। বেতন হ'ল নগদ চব্বিশ টাকা, পনর আনা—অর্থাৎ বেতন পঁচিশ টাকাই হ'ল, তার থেকে মাইনে প্রাপ্তির রসিদ-ষ্ট্যাম্পের দাম এক আনা কেটে নিয়ে স্কুলের কর্ত্তারা আমাকে চব্বিশ টাকা, পনর আনা দিতেন। কলেজে পড়বার সময়ে সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ ও কালীচরণের বক্তৃতা শুনে,স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করব, ম্যাট্‌সিনি-গা'রবল্ডি হব, দেশের মধ্যে দশজনের একজন হব বলে' আকাশে যে বাড়ী তৈরী করতাম, এক আঘাতে তা চূর্ণ হয়ে গেল—ভবিষ্যৎ দেশ-সেবার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল—বিধাতার বিধানে আমি হলাম এক গ্রামের স্কুলের পঁচিশ টাকা বেতনের থার্ড মাষ্টার। কি করব—ঐ কয়টী টাকা না হ'লে যে আমার ছোট ভাইয়ের কলেজে পড়া বন্ধ হয়! তাই, আমি ঐ ready-made চাকুরী নিতে বাধ্য হয়েছিলাম—অপেক্ষা করবার আমার সময় ছিল না।

আর এই মাষ্টারী চাকুরীটি বেশ! ও কাজের জন্য কোন প্রকার আয়োজন করতে হয় না, শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় পাস বা ফেল হ'লেই মাষ্টারী করবার সনন্দ পাওয়া যায়। অমন সোজা চাকুরী আর নেই; একদিনের জন্যও মাষ্টারীর শিক্ষাগ্রহণ করতে হয় না। ছেলে পড়ানো বিদ্যাটা আমরা এতই সহজ করে নিয়েছিলাম! ওর জন্য সাগরেদী করতে হয় না—একেবারে ওস্তাদ শিক্ষক। তা' 'যাই ব'ল না কেন' ঐ সহজপ্রাপ্য (এখন কিছু দুষ্প্রাপ্য) চাকুরীর পথ খোলা ছিল ব'লে আমাদের মত ফেল-করা মুর্খেরাও পার হয়ে গিয়েছিল।

থাকুক সে কথা। ১৮৮১ অব্দে পঁচিশ টাকা বেতনে গোয়ালন্দ স্কুলে থার্ড মাষ্টার হয়েছিলাম। দাদার কাছে থাকি, কোন ভাবনা নেই। মাইনের টাকা এনে বৌদিদির হাতে দিই; তিনি আমার ছোট ভাইয়ের পড়ার খরচ পাঠিয়ে দেন। খাই-দাই, ছেলে পড়াই, পূর্ব্ব সংস্কার বশে স্বদেশীও করি, ছেলেদের নিয়ে সভাসমিতি করি, বড়দের সঙ্গে মশে দেশোদ্ধারেরও পাণ্ডাগিরি করি। গোয়ালন্দের উকিল মোক্তার বড় বড় কর্ম্মচারী সকলেই আমাকে ভালবাসতেন ও আদর করতেন, কারণ আমি বাল্যকাল থেকেই গোয়ালন্দে ছিলাম। গোয়ালন্দের মাইনর স্কুল থেকেই পরীক্ষা দিয়ে পাঁচ টাকা বৃত্তি পাই, তারপর অবস্থাবিপর্য্যয়ে সেই মাইনর স্কুল এণ্টান্স স্কুলে পরিণত হলে আমি শিক্ষক হয়ে আসি। এই জন্যই আমি সকলের কাছে আবদার করতে পারতাম এবং তাঁরা সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতেন।

সেই যে ৮১ অব্দে ২৫৲ টাকা বেতনে মাষ্টারী আরম্ভ করেছিলাম, ৮৫ অব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আমার সে মাইনে আর বাড়েনি। ঐ সালের শেষ ভাগে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের শুভদৃষ্টি আমার উপর পড়ল। তাঁরা আমার

বেতন ৫৲ টাকা বাড়িয়ে দিলেন। এ যে আমার যোগ্যতার পুরস্কার, সে কথা মনে করবেন না বন্ধু! পাড়াগাঁয়ের স্কুলের মাষ্টারদের যোগ্যতার পুরস্কার তখনও কেউ দেয়নি; এখনও দেয় না। আমার এ বেতন-বৃদ্ধির কারণ এই যে, স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষেরা নানাভাবেই জানতে পেরেছিলেন যে, আমাদের দরিদ্র সংসারে আর একটী লোকবৃদ্ধি হয়েছে। সেই নবাগত লোকটীর খোরাকি বাবদ তাঁরা আমার ৫৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি করে, দেন। সে নবাগত আর কেহ নন—আমার স্ত্রী। সেই বৎসরের প্রথম ভাগে আমি বিবাহ করি।

এইবার আসল কথা বলি। ১৮৮৬ অব্দের শেষভাগে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা নগরীতে জাতীয় মহাসমিতির (কংগ্রেসের) দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে আমি গোয়ালন্দের জনসাধারণ কর্ত্তৃক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়ে যাই। তখনও কিন্তু আমার মধ্যে ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডির অস্তিত্ব লোপ পায়নি। ১৮৮৫ অব্দে বোম্বাইতে প্রথম কংগ্রেস হয়। আমাদের দেশপূজ্য উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonerji) সেই কংগ্রেসের সভাপতি হন। তিনিই দ্বিতীয় বৎসরের কংগ্রেসকে কলিকাতায় আহ্বান করেন। দ্বিতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন সর্ব্বজনমান্য দাদাভাই নৌরজী মহাশয়, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়। দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই কংগ্রেসে যোগদান করেন, এমন কি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় পর্য্যন্ত এই কংগ্রেসে বর্ক্তৃতা করেন। আমি গণ্যমান্য না হলেও, আমায় প্রবাস-স্থানের প্রতিনিধি হয়ে এই কংগ্রেসে যোগ দিই।

প্রথম দিনের কংগ্রেসের অধিবেশন হয় টাউন হলে। কলিকাতার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি মনে করেছিলেন—নানা স্থানের প্রতিনিধি ও

দর্শকে এত অধিক লোক হবে, যাদের স্থান বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে নাও হতে পারে।

কোন প্রকারে প্রথম দিনের কার্য্য শেষ হয়ে গেল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও মূল সভাপতি তাঁদেব অভিভাষণ পাঠ করলেন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গৃহে হ'ল। সেইদিনের সভা শেষ হওরার পূর্ব্বেই সুরেন্দ্রনাথ জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন যে, পরদিন টাউন হলে আবার কংগ্রেসের অধিবেশন হবে।

পরদিন যথাসময়েব পূর্ব্বেই টাউন হলে গেলাম। পূর্ব্ব দুই দিন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম, তার জন্যই সভারম্ভের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে টাউন হলে উপস্থিত হয়েছিলাম। আর সেই জন্যই প্রতিনিধিদের নির্দ্দিষ্ট আসনের প্রথম শ্রেণীতেই স্থান সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। তাতে আমার পক্ষে দেখা-শোনার যথেষ্ট সুবিধা হয়েছিল। প্রথম দিনের অধিবেশন আরম্ভ হবার আধ ঘণ্টা পূর্ব্বেই দেখতে পেলাম—একটী গৌরবর্ণ যুবক মঞ্চের উপর এবং মঞ্চের চারিপাশে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন। যুবকটি দেখতে যেমন সুন্দর, তার পরিচ্ছদও তেমনি পরিপাটী; দেখলেই বুঝতে পারা যায় তিনি খুব সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান। চোখে সোণার চশমা, গায়ে লম্বা একটা কোট, গলায় একটা আলোয়ান জড়ানো—সেই আলোয়ানের উপর দু দু'টা ব্যাজ্—একটি অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যের, আর একটী প্রতিনিধির। আর তিনি যে ভাবে বড় বড় রথীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, সম্ভ্রান্ত অভ্যাগতদিগকে অভ্যর্থনা করছিলেন, তা দেখে বুঝতে পারলাম যে, তিনি যুবক হলেও কংগ্রেসের একজন বড় পাণ্ডা। আমার পার্শ্বে যে বাঙ্গালী প্রতিনিধিটি বসে ছিলেন, তাঁকে ঐ যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে তিনি অবাক

হয়ে বল্লেন, সে কি মশায়!—ওঁকে আপনি চেনেন না। উনি বরিশালের অশ্বিনীবাবু। আমি বিনীতভাবে বল্লাম, ওঁর নাম অনেক শুনেছি, কিন্তু পাড়াগাঁয় থাকি, তাই চিনতে পারি নি।

অনেকের স্বভাব আছে লোকের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করে। আমার সে স্বভাব মোটেই তখনও ছিল না, এখনও নেই। আমি কারও সঙ্গে আপনা হ'তে আলাপ জমাতে পারি নে, এখন তো মোটেই পারি নে, যৌবন কালেও পারতাম না। কাজেই দেশমান্য অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হ'ল না। আমি সেই সৌম্যমূর্ত্তি যুবককে দূর থেকে দেখেই তৃপ্তি লাভ করলাম।

যথাসময়ে সভা আরম্ভ হ'ল। সেই দিনের দুইটি ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। তার মধ্যে একটী—উত্তরপাড়ার অশীতিপর বৃদ্ধ অন্ধ জমীদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সভায় আগমন। দুইজন লোকের স্কন্ধে ভর দিয়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন মঞ্চের উপর এলেন, তখন সকলেই দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। আমি তাঁকে চিনতাম না —তবুও সকলের দেখাদেখি আমিও দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম। আমার পাশের সেই ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করে' জানতে পারলাম—ইনিই সুপ্রসিদ্ধ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্ষীণ কণ্ঠ হ'তে যে বাণী প্রদত্ত হ'ল তার একটী কথা উদ্ধৃত করবার প্রলোভন আমি সংবরণ করতে পারছিনে। অশীতিপর অন্ধ বৃদ্ধ বল্লেন—

"It is no wonder that objects such as these should have drawn distinguished gentlemen from all parts of the country, when you find a blind old man like myself of 79 years of age bending under the infirmities of age, taking a part in the deliberations."

আর একটি যুবক সেদিন সত্যসত্যই আমাকে অভিভূত করে' ফেলেছিলেন। একটী প্রস্তাব সমর্থন করবার জন্য যখন তিনি মঞ্চের উপর এসে দাঁড়ালেন, তখন সমবেত প্রতিনিধি অবাক্ হযে সেই মূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইলেন। যুবকের বয়স তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর। পায়জামা-পরা, গায়ে লম্বা সাদা চাপকান, একখানি সাদা চাদর গলায় জড়িয়ে তার দুই প্রান্ত বুকের উপর দুইপাশে ঝুলিয়ে দিয়েছেন, মাথায় পাগড়ী, কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা। সত্যসত্যই অপূর্ব্ব-দর্শন মূর্ত্তি! তিনি এসে দাঁড়াতেই আমি পাশের সেই ভদ্রলোকটিকেও তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম,—তিনি বল্লেন—চিনি নে মশায়, বোধ পাঞ্জাবী কেউ হবে। তখন আর কাউকে জিজ্ঞাসা করবার অবকাশ পেলাম না। যুবকটি গম্ভীর স্বরে টাউন হলের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। আর বক্তার কি উদাত্ত স্বর!—এই বৃদ্ধ বয়সেও সে দৃশ্য যখন মনে করি, তখন আমি অতুল আনন্দ উপভোগ করি। এই যুবকের নাম অধুনা বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় মহাশয়। তিনি তখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের উদীয়মান ব্যবহারজীবী।

কংগ্রেসের কথা এইখানেই শেষ করি।—ভারত-উদ্ধার করে' যথাকালে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম। আবার 'সেই শিক, সেই দাঁড়, সেই একঘর।' রাজনীতি তখন ধামা-চাপা রইল। সংসারযাত্রা যথানিয়মে চলতে লাগল।

ডিসেম্বর মাসের শেষে কংগ্রেস হয়ে গেল। জানুয়ারীর প্রথম ভাগে একদিন বিকেল বেলা আমার একটী প্রিয় ছাত্র আমার কাছে এসে বললেন যে, তিনি বরিশালের অশ্বিনীবাবুর কাছ থেকে একখানি পত্র পেয়েছেন। আমার এই ছাত্রটির নাম শ্রীমান পঞ্চানন ব্রহ্মচারী। এঁর

বাড়ী বরিশালে এবং ইনি অশ্বিনীবাবুর অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তাঁর মাতুল বা কেউ গোয়ালন্দে ব্যবসা বাণিজ্য করতেন, পঞ্চানন সেইখানে থেকে আমাদের স্কুলে পড়ত। তারি কাছেই ইতঃপূর্ব্বে অশ্বিনীবাবু সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলাম। সে সময়ে একটা ব্যাপার দেখতে পেতাম, অশ্বিনীবাবুর ছাত্র, বন্ধু ও শিষ্যেরা যেখানেই যেতেন, সেখানকারই আব্‌হাওয়ার একটা পরিবর্ত্তন সাধিত করতেন—এমনই তাঁদের চরিত্রবল ছিল—এমনই উচ্চ আদর্শে তাঁরা গঠিত হয়েছিলেন।

শ্রীমান পঞ্চাননও সেই প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বরিশাল ব্রাহ্ম-সমাজের বর্ত্তমান আচার্য্য, আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখনও কলিকাতায় এলে আমার সঙ্গে দেখা করে' পঞ্চাননের গুণগান করেন। আর তার চরিত্র-মাধুর্য্য যে আমিই বিকশিত করে' দিয়েছিলাম, একথা বলে আমাকে লজ্জিত করেন। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চাননের জীবন অশ্বিনীবাবুর আদর্শেই গঠিত হয়েছিল।

যাক্ সে কথা। পঞ্চানন আমাকে বললেন যে, অশ্বিনীবাবু কংগ্রেসের মতপ্রচারের জন্য অতি শীঘ্রই ফরিদপুর ও ঢাকা অঞ্চলে আসবেন। তাঁর ইচ্ছা যে গোয়ালন্দে একদিন সভা করে' কংগ্রেসের বার্ত্তা প্রচার করেন। তিনি লিখেছেন যে, গোয়ালন্দে তাঁর পরিচিত কেউ নেই, তবে বিগত কংগ্রেসে গোয়ালন্দ থেকে আমি প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলাম—কংগ্রেসের কাগজপত্রে এ-কথা তিনি দেখেছেন। আমি তাঁকে সাহায্য করতে পারি কি না, এই কথা তিনি জিজ্ঞাসা করে' পাঠিয়েছেন এবং একদিনের জন্য তাঁর অবস্থানের কি সুবিধা হবে, সে কথাও পঞ্চাননের কাছে জানতে চেয়েছেন। এ নিতান্তই অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় ব্যাপার। যে অশ্বিনীকুমারকে কংগ্রেসমণ্ডপে দেখে তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার বাসনা আমার মনে উদিত হয়েছিল, সেই

অশ্বিনীকুমার অযাচিতভাবে আমার আতিথ্য গ্রহণ করতেও উৎসুক !

অশ্বিনীকুমারের নির্দ্দিষ্ট দিনে গোয়ালন্দে সভার ব্যবস্থা আমি অনায়াসেই করতে পারি। কিন্তু তাঁর মত বড়-মানুষের ছেলেকে আমার ক্ষুদ্র কুটীরে একদিনের জন্যও আতিথ্য গ্রহণ করবার অনুরোধ করতে আমার সঙ্কোচ বোধ হ'ল। তখন পঞ্চাননকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে, আমি বাড়ীর ভিতর বড়দাদার কাছে গেলাম। তাঁকে সব কথা বলতে তিনি বল্লেন—তাই তো—কি করা যায় ! আমাদের এই ছোট চালা-ঘর—খড়ের চাল—দরমার বেড়া। এ কুঁড়ে ঘরে তাঁর মত মহামান্য অতিথিকে ডেকে আনি কি করে ?

বড়বৌদিদি বল্লেন—"তাতে কি হয়েছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে বিদুরের ক্ষুদ খেয়েছিলেন ! ঠাকুরপো, তাঁকে আসতে লিখে দাও। আমরা প্রাণপণে তাঁর অভ্যর্থনা করব। কি বলিস্ সেজো !" এই বলে তিনি তাঁর পশ্চাতে দণ্ডায়মান আমার স্ত্রীর গায়ে ঠেলা দিলেন। বড়দাদার সম্মুখে তো তিনি আর কথা বলতে পারেন না—ঘাড় নেড়ে বৌদিদির প্রস্তাবে সম্মতি দান করলেন। আমি উৎফুল্লচিত্তে বাইরে এসে পঞ্চাননকে বললাম—"দেখ পঞ্চানন, অশ্বিনীবাবু হয় ত মনে করেছেন—আমি গোয়ালন্দের অতি গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তি। তুমি তাঁর সে ভ্রম ঘুচিয়ে দাও। তাঁকে লেখ, আমি ২৫৲ টাকা মাইনের গরীব স্কুল-মাষ্টার। আমার ঘর সত্যসত্যই কুটীর। তিনি এই শুনে যদি আমার বাড়ীতে পদধূলি দেন—আমি ধন্য হয়ে যাব। তুমি তাঁকে চিঠি লেখ—আমিও কাল তাঁকে চিঠি লিখব।

পঞ্চানন অশ্বিনীবাবুকে কি লিখেছিল জানি নে—খুব সম্ভব আমি যা' বলেছিলাম তাই লিখেছিল। আমিও ঐভাবেই বরিশালে অশ্বিনীবাবুকে পত্র লিখেছিলাম। তার উত্তরে তিনি আমাকে যা লিখেছিলেন—সে

কথাগুলো ঠিক ঠিক বলতে পারব না—তবে এটুকু বেশ মনে আছে যে, গোয়ালন্দে যদি ঢাকার মাননীয় নবাব বাহাদুরের রাজপ্রাসাদ থাকত আর সেখান থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ আসত, তা' হলেও তিনি সে নিমন্ত্রণ অস্বীকার করে আমার ক্ষুদ্র কুটীরে আসতেন।

তার পাঁচ ছয় দিন পরে এক বুধবারে অশ্বিনীবাবুর পত্র পেলাম। তিনি পরবর্ত্তী শনিবার প্রাতঃকালে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে উপস্থিত হবেন, আমি যেন সেইদিন অপরাহ্নে সভা করবার ব্যবস্থা করি এবং তাঁকে আমার বাড়ীতে নিয়ে আসি।

যথানির্দ্দিষ্ট শনিবারের প্রত্যূষে মেল-গাড়ীতে অশ্বিনীবাবু গোয়ালন্দ ষ্টেশনে পৌছলেন। একটী চাকর ব্যতীত সঙ্গে আর কেহ ছিল না। তাঁর আসবার দুইদিন আগে থেকেই আমরা সভার বিজ্ঞাপন ও নিমন্ত্রণ-পত্র সকলকেই দিয়েছিলাম। বাজারের নিকট প্রশস্ত ময়দানে সভার স্থান করা হয়েছিল। আমরা স্থির করেছিলাম—উন্মুক্ত আকাশতলেই সভা হবে, কিন্তু বাজারের আড়তদার ও দোকানদারগণ সে প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। তাঁরাই সভামণ্ডপ প্রস্তুত করার ভার নিলেন, আর আমার প্রকাণ্ড রেজিমেণ্ট স্কুলের ছাত্রেরা তাঁদের সহায়তা করতে লাগলেন। নিমন্ত্রণপত্র ও বিজ্ঞাপন প্রচারের ভার স্কুলের ছাত্ররাই গ্রহণ করেছিলেন।

গোয়ালন্দের সর্ব্বপ্রধান উকিল যাদবচন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন ও শনিবার প্রত্যূষেই ষ্টেশনে গিয়ে তিনিই সর্ব্বপ্রথম অশ্বিনীবাবুকে অভ্যর্থনা করবেন, এ কথাও স্থির হয়েছিল। আমাদের আরও একটা সুবিধা হয়েছিল। শনিবার কি উপলক্ষে অফিস, আদালত, স্কুল, সমস্তই বন্ধ ছিল। তার জন্য আমাদের লোকবলও বেড়েছিল এবং ষ্টেশনে অশ্বিনীবাবুর সংবর্দ্ধনার বিপুল আয়োজনও আমরা করতে পেরেছিলাম।

শনিবার প্রত্যুষে সত্যসত্যই ষ্টেশনে লোকারণ্য হয়েছিল। গোয়ালন্দের গণ্যমান্য ব্যক্তি সকলেই সেই শীতেও ষ্টেশনে সমবেত হয়েছিলেন। আড়তদার, দোকানদার, মুটে-মজুর সবাই বরিশালের অশ্বিনীবাবুকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিল, আর আমাদের স্কুলের আড়াই শত ছেলে লাল নিশান হাতে করে' ষ্টেশনের সম্মুখে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। যথাসময়ে গাড়ী ষ্টেশনে পৌছিলে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী থেকে নামবার পূর্ব্বেই যাদববাবু গাড়ীর ভিতর উঠে তাঁর গলায় মালা দিয়ে অভ্যর্থনা ক'রে প্লাটফরমে নামালেন। তখনও "বন্দেমাতরম্" দেশে আসে নি, কাযেই সমবেত জনমণ্ডলী করতালি দিয়েই এই মহামান্য অতিথিকে অভ্যর্থনা করলেন।

অশ্বিনীকুমার গাড়ী থেকে নামলে সম্মুখে যাঁরা ছিলেন, যাদববাবু তাঁদের সঙ্গে অশ্বিনীবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন। শিষ্টাচার-বিনিময়ের পর অশ্বিনীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কই, জলধর কই?" এ সমস্ত ব্যাপারে আমি কোনদিনই এগিয়ে দাঁড়াই নে—তখনও দাঁড়াতাম না, এখনও না। আনি সে সময়ে কতকগুলি লোকের পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম।

অশ্বিনীবাবুর প্রশ্ন শুনে যাদববাবু এদিক্-ওদিক্ চেয়ে দেখলেন যে, আমি পিছন দিকে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি তখন দৌড়ে গিয়ে আমাকে টেনে অশ্বিনীবাবুর সম্মুখে এনে বললেন—"এই নিন আপনার জলধর।"

অশ্বিনীবাবু সহাস্যবদনে বললেন—"কথাটা ঠিক হল না—বলুন, এই নিন "আমাদের জলধর।" সকলে আনন্দধ্বনি করে' উঠলেন। আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিতে গেলাম। তিনি হো-হো করে' হেসে বললেন—"পায়ে কি আর এখন ধুলো আছে ভাই" এই বলেই আমাকে কোলের ভিতর জড়িয়ে বললেন—প্রণাম আর করা হল না।

ষ্টেশনের বাইরে এসে কে একজন বললেন, "আপনার জন্য পাল্কীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।" সেই সদা-প্রফুল্ল-বদন অশ্বিনীকুমার জিজ্ঞাসা করলেন—"জলধরের বাড়ী এখান থেকে ক' ক্রোশ?"

যাদববাবুই জবাব দিলেন—"ক্রোশ তো নয়—আধ মাইলের কম।"

অশ্বিনীবাবু বললেন—"আপনারা ভুলে যাচ্ছেন আমি বরিশালের বাঙ্গাল অশ্বিনী দত্ত। এখনও প্রতিদিন সকালে উঠে আমি তিন চার ক্রোশ হাঁটি।" তখন সকলে মিলে হাঁটতে হাঁটতেই আমার বাসায় এলেন। আমার বড়দাদা ষ্টেশনে যান নি, বাড়ীর ব্যবস্থাতেই ব্যস্ত ছিলেন। তিনি আমাদের বাসার সম্মুখেই দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা সকলে নিকটস্থ হলে, যাদববাবু দাদাকে দেখিয়ে বললেন—"ইনিই জলধরের দাদা দ্বারিকবাবু—আজ আপনি এঁরই অতিথি।" বড়দাদা নমস্কার করবার জন্য হাত তুলতেই, অশ্বিনীবাবু নতজানু হয়ে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলেন। তারপরই দাদা অতি মৃদু স্বরে বললেন, —"আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনি দয়া করে' আমাদের বাড়ীতে এসেছেন।"

সে কথার উত্তরে তিনি যা' বললেন, তা' তাঁর মত সদাশয় মহৎ হৃদয় ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। তিনি বললেন,—"আমি কি আপনার বাড়ী এসেছি? আমি আমার বাড়ীতেই এলাম—কোন শিষ্টাচার দেখাবেন না দাদা। আমি আপনার ছোট ভাই অশ্বিনী।"

এমন করে' কেউ যে নিতান্ত অপরিচিত ব্যক্তিকে একান্ত আপনার জন করে' নিতে পারে, এ আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নি। অশ্বিনীবাবুর কথা শুনে উপস্থিত সকলে ধন্য ধন্য করে' উঠলেন। আমার বড়দাদাও উপযুক্ত দাদা—তিনি বললেন, "আমার একটু ভুল হয়েছিল অশ্বিনীকুমার —যাও, তোমার বাড়ী-ঘর তুমি দেখে নাও।"

তারপর আমাদের বাইরের যে ঘরে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করে' চারিদিক একবার চেয়ে দেখে বললেন—"এ কি করেছেন দাদা—এ যে রাজ-অভ্যর্থনা!"

করা হয়েছিল তো ভারী! একখানা-চৌকির উপর বিছানা পেতে রাখা হয়েছিল—আর প্রতিবেশীদের বাড়ী থেকে ধার ক'রে খানকতক ভাল চেয়ার, দু'খানা টেবিল ও একটি আল্না আনা হয়েছিল। এই হল তাঁর রাজ-অভ্যর্থনা।

দাদা বললেন, "আমি ওর কিছুই করিনি। যাঁরা করেছেন, যাও তাঁদের সঙ্গে বোঝা-পড়া কর গিয়ে।"

"তাই যাচ্ছি" বলেই কাপড়-চোপড় না ছেড়েই অশ্বিনীবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর আমার হাত ধরে বল্লেন—"চল জলধর—গৃহলক্ষ্মীদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আসি। বাড়ীতে কে আছেন না আছেন, সে খবর আমি পঞ্চাননের চিঠিতে জানতে পেরেছি।"

আমি তাঁকে সঙ্গে করে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেলাম। বড়বৌদিদি তখন বারান্দায় জলখাবার সাজাচ্ছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁর সম্মুখে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে' বল্লেন—"আপনি যে বড়বৌদিদি, তা' আমি বুঝতে পেরেছি। কথা বলে' আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

বড়বৌদিদি বুঝলেন—আচ্ছা লোকের হাতে পড়েছেন। কথা না বলে' পারলেন না, বললেন—"আশীর্ব্বাদ করি—ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক।" অশ্বিনীবাবুর সেই হাসি! বললেন—"ওর একটাও আমি চাই নে। যাক্ সে কথা পরে হবে। কই আর এক লক্ষ্মী কই!"

বৌদি বল্লেন—"আপনার আসবার সাড়া পেয়েই সে ঐ ঘরে পালিয়েছে।"

অশ্বিনীকুমারের কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ নেই—আমার শয়ন-ঘরের ভিতর প্রবেশ করে' আমার স্ত্রীর হাত ধ'রে টেনে এনে বল্লেন—"আমি ও লজ্জা-টজ্জা মানব না। এ জীবটিকে কোথায় পেয়েছেন বৌদিদি ?"

বড়বৌদিদি বল্লেন—"শিবনিবাসের কাছে দেওয়ানের বেড়ে।"

"ওরে বাবা ! শিবনিবাস ?" এই বলে'ই ছড়া কাটলেন—

"শিবনিবাসী তুল্য কাশী—
ধন্য নদী কঙ্কনা !"

বৌদিদি, আমি দেওয়ানের বেড়ের ইতিহাসও পড়েছি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান রঘুনন্দনের স্থাপিত এই দেওয়ানের বেড়।" বড়বৌদি বল্লেন—"এতও আপনি জানেন!—এ সেই দেওয়ান রঘুনন্দনের প্র-পৌত্রী। এখন এসে আমার স্কন্ধে ভর করেছেন।"

"আচ্ছা। সে পরিচয় পরে করা যাবে, এখন বাইরে গিয়ে হাত-পা ধুইগে।"

বাইরে এসে সভার কথা জিজ্ঞাসা করতেই আমি তাঁকে বললাম, "আজই সাড়ে তিনটেয় সভা হবে, বাজারের কাছে। সবই ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। আপনি জলটল খেয়ে বিশ্রাম করুন—আমি একবার দেখে আসি সব ঠিক হচ্ছে কি না।" এই বলে' আমি চলে' গেলাম। যখন ফিরে এলাম, তখন বেলা প্রায় একটা।

বাড়ী এসে তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে দেখি—দাদার ঘরের বারন্দায় অশ্বিনীবাবু আহার করতে বসেছেন। তিনি তখন নিরামিষাশী ছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন—"দেখ জলধর, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করতেই চেয়েছিলাম। তা' তোমার ঐ লক্ষ্মীটী আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তুমি হয় তো এ বেলা আসবেই না, একেবারে সভা শেষ করে' আসবে। আমি ওর কথা বিশ্বাস করে তোমাকে ফেলেই খেতে বসেছি।

দাদাকে বাইরের ঘরে নির্ব্বাসিত করে' ওরা দুইজনে আমাকে নিয়ে পড়েছে। বড় শক্ত বাঁধনেই ভাই ফেললে আমাকে!" তারপর যে কত কথা—কত হাসি-তামাসা—সে সব কথা মনে হলেও এখন আমার চোখে জল আসে।

তারপর যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে অপরাহ্ন সাড়ে তিনটায় সভার অধিবেশন হ'ল। আমাদের স্কুলের পণ্ডিতমশায় স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে অশ্বিনীকুমারকে অভ্যর্থনা করলেন। অশ্বিনীবাবু আমাদেব দেশের শাসন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ সম্বন্ধে এক ঘণ্টার উপর বক্তৃতা করলেন। সকলের শেষে আমি ধন্যবাদ করলাম! সভার কার্য্য শেষ হ'ল। অশ্বিনীকুমার এই অনুষ্ঠান দেখে বড়ই সন্তুষ্ট হলেন।

তারপর আমরা বাড়ী ফিরে এলাম। অশ্বিনীবাবু বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাত্রে খানিকটা দুধ ব্যতীত আর কিছুই খেলেন না। গরীবের যা' কিছু আয়োজন হয়েছিল, আমরাই তার সদ্ব্যবহার করেছিলাম।

শয়নের কিছু পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমাব একবার বাড়ীর ভিতর গিয়ে আমারই সম্মুখে বড় বৌদিকে বল্লেন—"বৌদি, যা' মনে করেছেন—তা' নয়। অশ্বিনীকুমার কাল সকালে যাচ্ছেন না।"

এ কথার জবার আমার স্ত্রী দিলেন—"কে আপনাকে যেতে বলেছে মশায়! থাকুন না দশ-পনর দিন আমাদেব এখানে!"

"সত্যসত্যই তাই ইচ্ছে করছে", এই বলে' মাথা চুলকোতে চুলকোতে অশ্বিনীবাবু বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে তাঁর চাকরটিকে বাড়ীতে রেখে আমাদের চাকরকে সঙ্গে নিয়ে অশ্বিনীবাবু বেড়াতে বেরুলেন। বেলা প্রায় আটটার সময়ে যখন ফিরলেন— তখন তাঁর পেছনে আমাদের চাকরের মাথায়

একটা ঝাঁকা আর একটা নগদা কুলীর মাথায় একটা ঝুড়ি। এই দৃশ্য দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এ সব কি দাদা!" অশ্বিনীকুমার হিন্দী বাত্ আওড়ালেন—"তফাৎ যাও। কোহি বাত মত্ বোলো।" এই বলে' লোক দুটোকে নিয়ে বাড়ীর ভেতর চ'লে গেলেন—আমি আর তাঁর অনুসরণ করলাম না, কারণ জানতাম তখন বড়দাদা বাড়ীর ভেতরে আছেন। বড়দাদা একটু পরেই বেরিয়ে এসে বললেন—"দেখ গিয়ে জলধর, তোমার পাগলের কাণ্ড। বাজারের আর কিছু বাকী রাখেনি।"

তার খানিকটা পরেই বাড়ীর ভেতর গিয়ে দেখি—উঠানের দড়ীর ওপর তাঁর গরম কোট ও শাল ঝুলছে; পায়ের জুতা-মোজা খুলে উঠানে ফেলে দিযে—মহাপুরুষ বসে' কুটনো কুটছেন। পাশে আর একখানা বঁটী নিয়ে আমার স্ত্রীও তাঁর সাহায্য করছেন।

আমি বললাম, "দাদা ও কি, হাত কাটবেন যে?"

আমার স্ত্রী জবাব দিলেন—"ভগবান, তাই যেন হয—যতদিন কাটা ঘা না শুকোবে, ততদিন তো আমাদের কথা মনে থাকবে!"

অশ্বিনীকুমার বললেন—"জলধর, তোর এই গৃহিণীর জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। এর কথারও অন্ত নেই—হাসিরও অন্ত নেই!"

তারপর অশ্বিনীকুমার একবার রান্নায় যোগ দিচ্ছেন, আর একবার বা বাইরে এসে যাঁরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তাঁদের বলছেন—"আমি কালকের অশ্বিনীকুমার নেই মশায়—আমি আজ এ বাড়ীর রাঁধুনী।"

এই দুই দিনে অশ্বিনীকুমার আমার ক্ষুদ্র কুটীরকে একেবারে আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। পরদিনের ভোরের ষ্টীমারে তিনি যখন ঢাকা রওনা হন, তখন তিনিও চোখের জল ফেলেন, আমার বৌদিদি ও

আমার গৃহিণীও চোখের জল ফেলেন। কথা আর কেউ বলতে পারলেন না, উভয় পক্ষের চোখের জলেই বিদায়াভিনন্দন হয়ে গেল।

তার পর! তার পরের কথাও বলতে হবে?

পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার নয় মাস পরে একদিন অপরাহ্নে গোলদীঘির ধারে ফুটপাতের উপর অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে আমার দেখা—আমি তখন হিমালয়ের যাত্রী।

অশ্বিনীকুমার সেই রাস্তার মধ্যেই আমাকে জড়িয়ে ধরে' তিরস্কার করে' বল্লেন, "হাঁরে জলধর, এত নিষ্ঠুর তুই—এই ন মাসের মধ্যে একটা খবরও দিলি নে।" আমি শুষ্কমুখে বল্লাম—"খবর তো কিছু নেই দাদা, সব খবর শেষ হয়ে গিয়েছে!"

"সে কি, আমি যে বুঝতে পারছিনে!" আমি বললাম—"শুনবেন দাদা! আপনার সঙ্গে শেষ দেখার চার মাস পরে আমার একটি কন্যা-সন্তান হয়। বারদিন পরেই সেটি মারা যায়। তার বারদিন পরেই আমার গৃহিণীও সেই পথে যান। তার তিন মাস পরে আমার মাতা-ঠাকুরাণীও চলে' গিয়েছেন। এখন আমি হিমালয়-যাত্রী।"

"এঁ্যা—কি বলিস!" এই বলে' সেই মানবশ্রেষ্ঠ গোলদীঘির পার্শ্বের রেলিং-এ ভর দিয়ে নতমুখে দাঁড়ালেন। দুই চোখ দিয়ে জল পড়েত লাগল। আমি চুপ করে' তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দুই-তিন মিনিট পরেই আত্মসংবরণ করে' অশ্বিনীকুমার ধীরে ধীরে বল্লেন—"জলধর—এ আনন্দের হাট সকলের ভাগ্যে বেশীদিন টেঁকে না। হিমালয়ে যাচ্ছ, যাও। দেখ, যদি শান্তি পাও।"

আমার গোয়ালন্দে অবস্থান-কালে সর্ব্বপ্রধান ঘটনা—আমার প্রবাস-ভবনে কাঙাল হরিনাথের পদধূলি-দান। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমার

"কাঙাল হরিনাথ" গ্রন্থের ১ম খণ্ডে দিয়েছি। ঐ গ্রন্থ থেকেই তার বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

আমি তখন গোয়ালন্দে থাকি। কাঙাল আমাকে পত্র লিখলেন যে, তিনি দল লইয়া ফরিদপুর কৃষিপ্রদর্শনীতে গান করিতে যাইতেছেন। আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গী হইতে হইবে। তখন বড়দিনের ছুটি ছিল। আমি প্রস্তুত হইলাম। তাঁহারা শেষরাত্রির গাড়ীতে গোয়ালন্দ পৌঁছিলেন। আমি প্রস্তুত হইয়া ষ্টেশনেই ছিলাম। এক সঙ্গে ষ্টীমারে চড়িয়া ফরিদপুরে গেলাম। আমাদের গ্রামবাসী এক্ষণে পরলোকগত প্রসন্নকুমার সান্যাল মহাশয় ফরিদপুরে ওকালতি করিতেন। তিনি কাঙালের ছাত্র এবং আমাদের মাষ্টার। আমরা তাঁহার বাসায় উঠিলাম। সেদিন আর গান হইল না। তাহার পরদিন মেলাকমিটীর সেক্রেটারী মহাশয় বলিয়া গেলেন যে, সেইদিন অপরাহ্ণকালে মেলার মণ্ডপে ফিকিরচাঁদের গান হইবে।

আমরা ফরিদপুরে যাইয়াই শুনিলাম যে, প্রসিদ্ধ পাগ্‌লা কানাই ফরিদপুরে গান করিতে আসিয়াছে। পাগ্‌লা কানাইয়ের নাম কলিকাতা অঞ্চলের লোক না জানিতে পারেন ; কিন্তু এক সময়ে পাগলা কানাইয়ের গানে যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা ও নদীয়া জেলার অংশ-বিশেষ ভাসিয়া গিয়াছিল। পাগ্‌লা কানাইয়ের গান শুনিবার জন্য এক এক সময়ে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান একস্থানে সমবেত হইত। একদিনের পথ হাঁটিয়া লোকে পাগলা কানাইয়ের গান শুনিতে আসিত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পাগলা কানাই বৃদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহার গলার এমন আওয়াজ ছিল যে, পঞ্চাশ হাজার লোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া গান করিলেও, সকলে তাহার গান শুনিতে পাইত। আমরা ফরিদপুরে উপস্থিত হইয়া

শুনিলাম যে, আমাদের যে সময়ে গান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে অর্থাৎ মধ্যাহ্ন বারটার সময় পাগলা কানাইয়ের গান আরম্ভ হইবে। কাঙাল বলিলেন, "তোরা ত সে গান শুনিস্ নাই, কানাইয়ের গান শুনিলে লোকে পাগল হইয়া যায়!"

আমরা বেলা ১২টার সময়ে মেলার মাঠে গিয়া দেখি, সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য! অনুমান ত্রিশ হাজার হিন্দু হিন্দু-মুসলমান কানাইয়ের গান শুনিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। একটু পরেই মাথায় লম্বা-লম্বা চুলওয়ালা দশ বার জন লোক কানাইকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। জনসংঘের হিন্দুগণ "হরিবোল" এবং মুসলমানগণ "আল্লা-আল্লা" ধ্বনি করিয়া অভ্যর্থনা করিল। সে যে কি আনন্দ, সে যে কি উন্মাদনা, তাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। যাহারা গান করিতে আসিয়াছে, তাহাদিগের জন্য একটি কাষ্ঠের মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাহারই উপর দাঁড়াইয়া গান না করিলে, কানাইকে কেহ দেখিতে পাইবে না বুঝিয়াই মেলাব কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কানাই ও তাহার দলের লোকেরা মঞ্চের উপর আরোহণ করিল; প্রত্যেকের হস্তে একখানি করিয়া খঞ্জনী; আর কোন বাদ্যযন্ত্র নাই। একটু পরেই তাহারা গান আরম্ভ করিল। এই যে ত্রিশ হাজার লোক, ইহারা মন্ত্রমুগ্ধের মত গান শুনিতে লাগিল। তাহারা যে কয়টী গান গাহিল, সমস্তই অনিত্যতা সম্বন্ধে। আমরা অবাক হইয়া এই দশটী লোক ও বৃদ্ধ কানাইয়ের সুররাজি, সুরের খেলা শুনিতে লাগিলাম। ধন্য আওয়াজ! ধন্য শিক্ষা! আমি সে গানের বর্ণনা করিতে পারিলাম না; যাঁহারা পাগলা কানাইয়ের গান শুনিয়াছেন, তাঁহারাই আমার কথা বুঝিতে পারিবেন।

পাগলা কানাইয়ের গান চারিটা পর্য্যন্ত চলিবে, তাহার পরেই ফিকিরচাঁদের গান আরম্ভ করিতে হইবে। সৌভাগ্যের কথা এই,

তাহাদিগকে সেই মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া গান করিতে হইবে না ; তাহা হইলে আমি যোগ দিতেই পারিতাম না। মেলার জন্য যে মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই মণ্ডপেই ফিকিরচাঁদের গান হইবে ; সহরের ভদ্রলোক, সাহেব-বিবি ও মফঃস্বলের নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ সেইখানেই সমবেত হইবেন।

তিনটা বাজিয়া গেল, তখন আমরা আর পাগলা কানাইয়ের গান শুনিবার জন্য সেখানে থাকিলাম না। মেলার মধ্যেই একটি ঘরে আমাদের দলের সাজসরঞ্জাম রক্ষিত হইয়াছিল। কাঙালের ত আর সাজের প্রয়োজন ছিল না—তাঁহার ফকিরেরই বেশ! আর সকলে ফকির সাজিবার জন্য ঘরের মধ্যে গেল। কাঙাল ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার দৃষ্টি উদাস ; তিনি কি যেন ভাবিতেছিলেন। আমি তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট। তিনি একটু পরে বলিলেন, "কানাইয়ের গান শুনলি ত। এর পরে কি তোদের গান জম্‌বে, তোরা কি পারবি? আমি তাই ভাবছি।" এ কথার কি উত্তর দিব! আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম। একটু পরেই তিনি বলিলেন, "তোর কাছে কাগজ-পেন্সিল আছে? আমি বলিলাম "আছে।" তিনি বলিলেন, এই যে জনসমুদ্র দেখছিস, ইহাদের মধ্যে আজ মায়ের নাম ছড়াইয়া দিতে হইবে। তুই কাগজ ধর, নূতন গান দিই। সেই গান নিয়ে প্রথমে আসরে যেতে হবে।" এই বলিয়া তিনি গান বলিতে লাগিলেন, আমি লিখিয়া লইলাম। গানটী এই—

আমার আজ এই নিবেদন, লজ্জাবারণ, কর মা লজ্জারূপিণী।
মা, তোমার যে নাম জপে, হৃদয়-কূপে নিরজনে যোগী-মুনি ;
সেই নাম আজ জনসমাজে, ফকির সাজে, গাইতে এলাম ও জননি!
মা, আমার হ'তেছে ভয় কাঁপে হৃদয়, হৃদে এস বীণাপাণি!

মা, তুমি আপনি বাজাও, আপনি গাও, আপনার নাম আমি শুনি।
মা, তুমি মা নাম দিয়ে, জাগাইয়ে, জাগালে কুলকুণ্ডলিনী ,
এ হৃদয়-বাঁধ ছুটিয়ে, ঢেউ উঠিয়ে, ভাবে নাচায় ভাবরূপিণী।
কাঙ্গালের গেছে লজ্জা, লোকলজ্জা, তোমার নামে পাগল দিনরজনী,
নামে না হয় কলঙ্ক, সেই আতঙ্ক, দেখিস্ অনন্তরূপিণী।

দেখিতে দেখিতে উপরিলিখিত গান প্রস্তুত হইয়া গেল। কাঙাল তখন বলিলেন, "এ গান লাগবেই, তোদের ভয় নাই।" আমি গান লইয়া ঘরের মধ্যে গেলাম। প্রফুল্ল, নগেন্দ্র সকলেই গান দেখিল।

প্রফুল্ল বলিল, "হাঁ ঠিক হয়েছে। আমিও সেই ভাবছিলাম। দেখব, আজ মা হারে কি পুত্র হারে!" প্রফুল্লের কথা শুনিয়া আজ সকলেই প্রফুল্ল হইল, সকলেরই হৃদয়ে বলের সঞ্চার হইল। প্রফুল্ল বলিল, "আজ আর অন্য যন্ত্রে হবে না। সবাই একখানা করিয়া খঞ্জনী হাতে লও।

কে একজন বলিল, "আমাদের এত খঞ্জনী নাই।" উকিল প্রসন্নদাদা সেখানে ছিলেন, তিনি বলিলেন, "তাহার জন্য ভাবনা নাই। কানাইয়ের দলের নিকট হইতে খঞ্জনী আনিয়া দিব।" প্রসন্নদাদার সেদিন আনন্দ দেখে কে? তিনি শুধু বলিতেছেন, "দেখিস্ প্রফুল্ল, আজ আমাদের গ্রামের নাম রাখিস্, আজ কাঙালের নাম রাখিস্।"

কানাইয়ের গান ভাঙ্গিয়া গেল। আমাদিগের আসরে যাইবার জন্য অনুরোধ আসিল। কাঙাল তখনও তৃণাসনে বসিয়া আছেন। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলাম, "এখন গাইতে যেতে হবে।" তিনি চকিত হইয়া বলিলেন, "বেশ, চল।" আমরা কাঙাল হরিনাথকে দলের সম্মুখে প্রথম সারির মাঝখানে লইয়া সকলে মণ্ডপাভিমুখে যাত্রা করিলাম। কাঙাল বলিলেন, "এখান হইতেই গান ধর।"

তখন একসঙ্গে পনরখানি খঞ্জনী বাজিয়া উঠিল, পনর জনের স্বর সপ্তমে চড়াইয়া গান আরম্ভ হইল—

"আমার আজ এই নিবেদন..."

চারিদিক হইতে লোক একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমরা তখন সত্যসত্যই কি এক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গান ধরিয়াছিলাম। মণ্ডপের দ্বারে পৌছিতেই গান জমিয়া গেল, সুরের একটা জমাট বাঁধিয়া গেল। আমরা ধীরে ধীরে মণ্ডপের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলাম। তখন আর আমাদের জ্ঞান ছিল না। আমরা প্রাণ খুলিয়া গান গাহিতে লাগিলাম। মণ্ডপের মধ্যে প্রায় দুই-তিন হাজার লোক। সকলে নিঃশব্দে গান শুনিতে লাগিল। যখন শেষের অন্তরা আমরা ধরিলাম, তখন কাঙাল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তখন নৃত্য আরম্ভ হইল। তখন আর দল বে-দল থাকিল না। মণ্ডপের লোকেরাও আসিয়া গানে যোগ দিলেন। বড়-ছোট, ধনী-দরিদ্র ভেদ থাকিল না। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! আমার ত মনে হইতে লাগিল—চারিদিক হইতে সহস্র কণ্ঠ গাহিতেছে—

"নামে না হয় কলঙ্ক—
মা নামে না হয় কলঙ্ক"—

প্রায় তিন কোয়ার্টার এই একটী গানই হইল। তাহার পরই ফকিরের দল মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া আসিল। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। কত জন আসিয়া কাঙালের পদধূলি লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন। বড় বড় রাজকর্ম্মচারী আসিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিয়া গেলেন, সেদিন যেন আমাদিগকে আর গান করিবার জন্য আহ্বান করা না হয়। পরের দিনও গান হইয়াছিল। সেদিনও ঐ ব্যাপার। তাহার পরের দিনই আমরা ফরিদপুর ত্যাগ করি।

ফরিদপুর হইতে প্রত্যাগমনের সময় ফিকিরচাঁদের দল এবং কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহার এই অযোগ্য শিষ্যের গোয়ালন্দের বাসায় দুইদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আমি তখন গোয়ালন্দে মাষ্টারী করিতাম।

কাঙ্গাল হরিনাথ ফিকিবচাঁদের দল সহ গোয়ালন্দে উপস্থিত হইলে সহরময় একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। আমাদের ক্ষুদ্র কুটিরে লোক আর ধরে না। গোয়ালন্দ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে দলে দলে লোক ফিকিরচাঁদের গান শুনিবার জন্য এবং কাঙ্গালকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল।

এই ঘটনার অল্পদিন পূর্ব্বে গোয়ালন্দে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে পূজনীয় হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় ও এক্ষণে পরলোকগত কালীশঙ্কর সুকুল মহাশয় এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের উপলক্ষে গোয়ালন্দে আগমন কবিয়াছিলেন। গোয়ালন্দে যে কয়েকজন ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা এই উৎসব উপলক্ষে বিশেষ ধুমধাম করিয়াছিলেন। এই উৎসবের পরেই গোয়ালন্দে মহা দলাদলি আরম্ভ হইল; হিন্দুসমাজভুক্ত মহোদয়গণ ব্রাহ্মসমাজের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিলেন। অবশ্য যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠায় যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহই আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন না। কিন্তু হিন্দুসমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ এই কয়েকটী ভদ্রলোককে নানাপ্রকারে নির্য্যাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের নিমন্ত্রণ বন্ধ হইল। এমন কি আমি জানি যে, এই দলের একজন ভদ্রলোক কোন হিন্দু-সমাজভুক্ত উকিলের বাসায় গমন করিয়া তাঁহার ফরাসে উপবেশন করিয়াছিলেন বলিয়া সেই ভদ্রলোকের সম্মুখেই হুঁকার জল ফেলিয়া দিবার জন্য উকিলবাবু চাকরদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন।

ফরিদপুর হইতে প্রত্যাগমনের সময় এই কথা আমি কাঙ্গালকে

বলিয়াছিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, "তবে আজ আমার বাড়ী যাওয়া হইবে না। দুইদিন তোর বাসাতেই থাকিতে হইতেছে।" এই কারণেই কাঙ্গাল হরিনাথ দলবলসহ গোয়ালন্দে আমাদের ক্ষুদ্র কুটীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যার সময়ে সকলে আমাদের বাসায় পৌছিলেন। আমার বড়দাদা এবং আমাদের বাসার সকলে হাতে স্বর্গ পাইলেন। রাত্রিতে কাঙ্গাল হরিনাথ বড়দাদার নিকট স্থানীয় দলাদলির কথা সমস্ত শুনিলেন। তাহার পর যখন সকলে শয়ন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, তখন কাঙ্গাল আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, আমি এখানকার দলাদলি মিটাইয়া দিয়া তবে বাড়ী যাইব।" আমি বলিলাম "পারিবেন কি?" তিনি তখন গম্ভীরভাবে বলিলেন "নিশ্চয়ই পারিব। দেখতে পাচ্ছিস্ না, কি অমোঘ অস্ত্র তোরা আমার হাতে দিইছিস্। এই ফিকিরচাঁদ অস্ত্রে তোরা যে পৃথিবী জয় ক'রতে পারিস, এ কথা কি এখনও বুঝতে পারিস নাই।" কাঙ্গালের কথাগুলি আমার নিকট দৈববাণী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কতদিন চলিয়া গিয়াছে, জীবনের উপর দিয়া কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু এখনও কাঙ্গালের সেই রাত্রির মূর্ত্তি আমার নয়ন সম্মুখে প্রতিভাত রহিয়াছে। কত কথা ভুলিয়া গিয়াছি, কত লোকের কত উপকার বিস্মৃত হইয়াছি। তখনকার নিষ্কলঙ্ক জীবন কত কলঙ্ককালিমায় মলিন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাঙ্গালের সে দিনের সে মূর্ত্তি আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই বলিয়াই কাঙ্গালের এত শিষ্য থাকিতে সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্য আমি তাঁহার জীবনকথা কীর্ত্তন করিবার প্রয়াসী হইয়াছি; কাঙ্গালের সেই গৌরকান্তি, সেই দীর্ঘ শ্মশ্রু, সেই তেজব্যঞ্জক মূর্ত্তি তখন যেন এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে পূর্ণ হইয়াছিল। আমার

মনে হইতেছিল এই মূর্ত্তির সম্মুখে পাপ, তাপ, মলিনতা, দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা এক মুহূর্তের জন্যও দাঁড়াইতে পারে না। এই মুখের বাণী শুনিলে সকলকেই অবনত মস্তক হইতেই হয়।

আমাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া কাঙ্গাল বলিলেন "কী ভাবছিস্?" আমি অন্যমনস্কভাবে বলিলাম "না, তেমন কিছু না।" কাঙ্গাল আমাকে আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ধীরে ধীরে সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আমাদের বাড়ীর মধ্যে যাইতে লাগিলেন, আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তিনি আমাদের বাড়ীর মধ্যে যাইয়া আমার দিদিকে ডাকিলেন। আমার দিদি কাঙ্গালের বড়ই প্রিয়পাত্রী ছিলেন। কাঙ্গাল যখন প্রথম কুমারখালিতে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন প্রথম যে কয়েকটী ছাত্রী ছিল তাঁহাদের মধ্যে তিনি অন্যতমা। আমার এই দিদিকে কাঙ্গাল মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত একইভাবে দেখিয়াছিলেন।

আমার দিদিকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ্, আমি একটা গান বাঁধব, তুই লেখ দেখি।" দিদি তখন তাড়াতাড়ি উঠানেই আসন পাতিয়া দিলেন এবং নিজে কাগজ কলম লইয়া বসিলেন। বাড়ীর মেয়েরা এবং আমি উঠানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। কাঙ্গাল সুর করিয়া গান বলিয়া যাইতে লাগিলেন। গানটী এই :

"ও ভাই বল্‌রে বল্ সবাই রে।
দলাদলি, গালাগালি, ধর্ম্মের কি ফল রে।
স্ত্রী-পুরুষে যার ঐক্য নাই, সহোদর যত ভাই ভাই,
সকল কাজেতে ঠাঁই ঠাঁই, সমাজ টলমল রে;
এখন সাকার আর নিরাকার তুলে,
দিচ্ছ খড়ো ঘরে আগুন জ্বেলে,
বাতাস দিয়ে অনলে হাসে শত্রুদল রে।

অসীম আকাশ মাথার 'পরে,
দেখ একবার বিচার ক'রে,
সূর্য্য তারা ঘোরে ফিরে, উদয় অস্তাচল রে ,
ওরে, তারার মাঝে যারা আছে,
দেখ্ তিনিও আছেন তাদের কাছে,
কেউ নেই তাঁর আগে পিছে, সমান তাঁর সকল রে।
কি ভাবে কে ভাবে কোথায়, ঠিক নাহি হয়রে কথায়,
ভাবের ঠাকুর ভাবেতে পায় প্রকাশ যে কেবল রে ;
ওরে, যে ভাবে যে হৃদয় গড়ে, তিনি,
সেই ভাবে তার হৃদ্-মন্দিরে,
নিজ স্বরূপ প্রকাশ ক'রে করেন যে শীতল রে।
শুন ভাই সাধুর বচন, তিনি যে সাধনের ধন,
সাধন বিনে ধর্ম্মকথন সকলি বিফল রে ;
ওরে, যে ভাবে যে হৃদয় গড়,
কিন্তু মনে প্রাণে সাধন কর,
বৃথা তর্ক বিচার ছাড় বুদ্ধির কৌশল রে।
যে রূপ সে রূপ স্বরূপ ধ'রে,
যদি সিদ্ধ হও ভাই সাধন ক'রে,
তখন বক্তৃতা ক'রে, খাবে না আর জল রে ;
তখন একটী কথার তেজোবলে,
কত পাষাণ শিলা যাবে গ'লে,
হবে এক সত্য বলে পূর্ণ ধরাতল রে।
কাঙ্গাল কয় সকাতরে, ভারতের পায় ধ'রে,
সাধনহীন এ বিচারে হবে গণ্ডগোল রে ;

ওরে, সাধন ক'রে যতনে,
যিনি পেয়েছেন সেই সত্যধনে,
তাঁর উপদেশ বিনে সকলই গরল রে।"

কাঙ্গালের গানের শব্দ পাইয়া দলের যাঁহারা বাহিরে নিদ্রা যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সকলে আমাদের বাড়ীর মধ্যের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন আর কি—ঐ গান আরম্ভ হইল। আমার দাদা একটা লণ্ঠন হাতে লইয়া কাগজ দেখিয়া গানের কথাগুলি বলিয়া দিতে লাগিলেন, আর দলের লোকেরা গান করিতে লাগিল। তখন পাড়ার সকলে ছুটিয়া আসিল; আমাদের বাড়ীর উঠানে আর লোক ধরে না; বাড়ীর মেয়েরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই থানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, লজ্জা, সঙ্কোচ কিছুই তখন থাকিল না। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! আমি অবাক্ হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম—বুঝিতে পারিলাম কাঙ্গালের একটু পূর্ব্বের সেই কথা, "দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না কি অমোঘ অস্ত্র তোরা আমার হাতে দিইছিস্"।

রাত্রি বোধহয় এগারটার সময় গান আরম্ভ হইয়াছিল, রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেল তবুও গান থামে না; একজন যদি চুপ করে, তবে আর একজন গান ধরে! চারিটি গানেই রাত্রি শেষ হইবার রকম হইল। তিনটার পর কাঙ্গালের হুঁষ হইল, তিনি তখন প্রকৃতিস্থ হইলেন। যেন কোন্ এক আনন্দলোক হইতে আবার আমাদের পৃথিবীতে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। গান ভাঙ্গিয়া গেল, কাঙ্গাল বিশ্রাম করিতে গেলেন। দলের অন্যান্য লোকেরাও বিশ্রাম করিতে গেল।

তখন আমি আর প্রফুল্লচন্দ্র বাহিরে যাইয়া ঘাসের উপর বসিলাম। প্রফুল্ল বলিলেন, "আজ রাত্রিতে আর ঘুম হইবে না, এস আমরা বসিয়াই

রাত কাটাই।" কিন্তু কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায়। প্রফুল্ল কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "কালকের জন্যে আমিও একটা গান বাঁধি।" আমি বলিলাম "বেশ।" তখনই কাগজ কলম আলো ঘাসের মাঠে আনিয়া দিলাম; প্রফুল্লচন্দ্র গান বাঁধিলেন। সে গানটি এই—

"আছে কি কোন ঠিক তার,
কখন তোমার নথী উঠে পেশ হইবে।
কিবা রাত কিবা সকালে, সাঁজ বিকালে,
যে কালে সে মন করিবে;
তখনই নথী ধরে, অবোধ তোরে,
জবাব দিতে তলব দিবে।
সে তলব চিঠি লয়ে, হুকুম পেয়ে,
যখন ধেয়ে দূত আসিবে;
তখন তোর আত্ম-স্বজন, স্ত্রী-পরিজন,
ক'রে যতন কে ঠেকাবে।
যখন সেই আদালতে জজের হাতে,
অবোধ রে তোর বিচার হবে;
তখন তোর সপক্ষেতে সাক্ষী দিতে,
দুটো কথা কে বলিবে।
যাদের তুই ভেবে আপন, করিস যতন,
তারা আপন না হইবে,
দেখিস্ তোর বিপক্ষেতে ছয় সাক্ষীতে,
তাঁর সাক্ষাতে সাক্ষ্য দেবে।
যাদের তুই হেলা করিস্, দেখ্‌তে নারিস্,
দেখিস্ রে বিষ শত্রু ভেবে;

হয়ত তার কেহ গিয়ে তোমার হ'য়ে
দুটো কথা তাঁয় বলিবে।
ফিকিরচাঁদ বলে তোরে, তৈয়াব হ'রে,
কি ব'লে জ'ব তখন দেবে ;
হ'লে জ'ব খেঁচা নেষা সাক্ষী কাঁচা,
পেয়ে সাজা ম্যাদে যাবে।"

এই গানটী শুনিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। গোয়ালন্দ সাব-ডিভিসন স্থান ; সেখানে আমাদের পাড়ায় দিনরাত্রি শুধু মামলা আর মোকর্দ্দমা, মোকর্দ্দমা আব মামলা, শুধু হাকিম আর শামলা। এ অবস্থায় শেষ মামলার সম্বন্ধে উকিল মোক্তার বাবুদিগকে সজাগ করিয়া দেওয়া বেশ সময়োপযোগী হইয়াছিল।

যাহা হউক, পবের দিন প্রাতঃকাল হইতেই গান আরম্ভ হইল। সেদিন রবিবার ছিল, কাছাবী সমস্তই বন্ধ। কাহাকেও সংবাদ দিতে হইল না, কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিতে হইল না ; কাঙ্গালের গৃহে কাঙ্গালের গান, তাহাতে আর নিমন্ত্রণ কি!

কিসে কি হয়, তাহা আমরা কেমন করিয়া বলিব। প্রাতঃকালে প্রায় আটটার সময় গান আরম্ভ হইয়াছিল, অপরাহ্ন তিনটা বাজিয়া যায় তবুও কেহ উঠে না। ব্রাহ্মদল, হিন্দুদল সকলেই উপস্থিত। যে কয়জন প্রধান উকিল হিন্দুদলের নেতা ছিলেন, তাঁহারা ঐ যে আসিয়া বসিয়াছিলেন, আর উঠিলেন না। সকলের প্রাণ মন ভিজিয়া গেল ; কোন দলাদলি, কোম প্রকার হিংসা দ্বেষ কিছুই কাহারও মনে থাকিল না! তিনটার সময় যখন গান ভাঙ্গিয়া গেল, তখন কাঙ্গালের নিকট সকলেই উপস্থিত হইলেন। তিনি তখন করযোড়ে সকলকে বলিলেন "আপনাদের নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে।" বড় বড় যাঁহারা

উপস্থিত ছিলেন, যাঁহারা হিন্দু সমাজপতি তাঁহারা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "অমন কথা বলিবেন না, আপনি কি অনুমতি করিবেন বলুন।" কাঙ্গাল সহাস্য বদনে বলিলেন, "আমার বড় সাধ যে, আজ রাত্রিতে আমার এই ভাইয়ের বাড়িতে আপনারা সকলে প্রীতি-ভোজন করেন।" তখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন; এত দলাদলি, এত যে হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া, এত যে ঠাট্টাবিদ্রূপ, সে সব কোথায় চলিয়া গেল,। সকলেই সাগ্রহে বলিলেন, "রাত্রিতে গানের পর আমরা সকলেই এখানে জলযোগ করিব।" আমার তখন ইংরাজ কবির সেই কথা মনে হইল: Those who came to scoff

Remained to pray.

তখন আমাদের ন্যায় গরীবের ক্ষুদ্র কুটীরে মহোৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। সে কি উৎসাহ, কি আনন্দ, তাহা আর বলিতে পারি না। আমাদের বন্ধুগণ, আমাদের প্রিয় ছাত্রগণ তখন পরম উৎসাহে মহোৎসবের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কোথা হইতে কে কি পাঠাইতে লাগিলেন, কে কি আনিতে লাগিলেন তাহার ঠিকানা হইল না। আমরা দরিদ্র ব্যক্তি; আমাদের সাধ্য কি যে এতগুলি ভদ্রলোকের সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা করিতে পারি। কিন্তু কাহাকেও কিছু ভাবিতে হইল না, যাঁহার কার্য্য—যাঁহার মহোৎসব, তিনিই সমস্ত যোগাইয়া দিতে লাগিলেন। দ্রব্যের অভাব হইল না—আমার এক একটী বালক ছাত্র তিনটী যুবকের কার্য্য একাকী করিতে লাগিলেন।

পাঁচটার সময় আবার গান আরম্ভ হইল। এবার অন্য রকমের গান হইতে লাগিল। এবার ফিকিরচাঁদ শুধু মায়ের নাম-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সেই 'মা' নাম শুনিয়া পাষাণও গলিয়া যায়, মানুষ ত দূরের কথা। আমাদের মনে হইতে লাগিল সে স্থানের গগন-পবন যেন

'মা' নামে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, চারিদিক হইতে সমস্ত প্রকৃতি যেন 'মা' নাম গান করিতেছে। এক একবার সমবেত জনমণ্ডলী যখন উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিতেছেন "মাগো মা" তখন মনে হইতে লাগিল, মা ব্রহ্মময়ী যেন সকলের সম্মুখে দণ্ডায়মানা থাকিয়া অভয় প্রদান করিতেছেন। সত্য সত্যই ফিকিরচাঁদের গানে তখন অসম্ভব সম্ভব হইয়াছিল।

রাত্রি এগারটার সময় গান শেষ হইল। তখন প্রীতিভোজন। সেও এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। কিছু বিচার নাই, অহঙ্কার নাই, কোন গর্ব্ব নাই—সে সময় সব এক হইয়া গেল। মৃত্তিকাসনে বসিয়া ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলে জলযোগ করিলেন। সকলেরই হৃদয় তখন মায়ের নামে নৃত্য করিতেছিল, তখন কি আর ভেদাভেদ থাকে? মায়ের এমনই খেলা বটে! কাঙ্গাল এই মহোৎসব ক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, আর এক একবার বলিতে লাগিলেন—"এ যে আনন্দ-বাজার!"

আমার জন্মভূমি কুমারখালি থেকে প্রকাশিত এবং আমার শিক্ষাগুরু ও জীবনের আদর্শ—কাঙাল হরিনাথ (তখন শ্রীযুক্ত হরিনাথ মজুমদার মহাশয়) সম্পাদিত "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" পত্রিকাব কথা পূর্ব্বেই বলা উচিত ছিল। প্রসঙ্গতঃ দু' এক স্থলে তার উল্লেখও করেছি, কিন্তু "গ্রামবার্ত্তা"র ধারাবাহিক ইতিহাস কোথাও লিপিবদ্ধ করিনি। এই স্থানে সেই কাজটা শেষ করি।

আমি আমার সাহিত্যসেবার প্রেরণা পেয়েছিলাম কাঙাল হরিনাথের কাছে। আর সুযোগ পেয়েছিলাম—"গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা"র মধ্য দিয়ে। "গ্রামবার্ত্তা"র জীবনের শেষ দুই বৎসর আমি নানা ভাবে ঐ পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম এবং তার অন্তিম সৎকার আমার ও

আর দু' চারজন বন্ধুর হাতেই হয়। সুতরাং, "গ্রামবার্ত্তা"র কথা বলতে গেলে আমার জীবনের একটা প্রধান কথা।

বড়ই আনন্দের কথা যে, "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা"র বিবরণ প্রকাশ করবার জন্ম আমাকে আয়াস স্বীকার করতে হবে না। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক—আমার পরম স্নেহভাজন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়া বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তার প্রথম খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ১৮১৮ থেকে ১৮৩৯ সন পর্য্যন্ত বাংলায় মুদ্রিত সাময়িক পত্রের একখানি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস তিনি প্রকাশ করেছেন। "গ্রামবার্ত্তা" ঐ সময়ের পরে প্রকাশিত হওয়ার জন্ম শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথের প্রকাশিত ১ম খণ্ডে তার স্থান পায়নি। কিন্তু শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"র দ্বিচত্বারিংশ ভাগের দ্বিতীয় খণ্ডে "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা"র একটী বিবরণ প্রকাশিত করেছেন। এই বিবরণটী উদ্ধৃত করে' দিলেই "গ্রামবার্ত্তা" সম্বন্ধে সকল বিবরণই পাঠকগণ জানতে পারবেন। ইহার সংগ্রহে কাঙালের ভ্রাতুষ্পুত্র পরম কল্যাণভাজন শ্রীমান্ ভোলানাথ মজুমদার সাহায্য করেছেন। শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথের ন্যায় খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের বিবরণ যে অভ্রান্ত, এ কথা আমি অকুণ্ঠ-চিত্তে বলতে পারি। নিম্নে সেই সঙ্কলিত বিবরণই প্রদত্ত হ'ল :—

১৮৬৩ সনের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৭০) কুমারখালীর বাংলা পাঠাশালার পণ্ডিত হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ) 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা' নামে একখানি মাসিক সমাচারপত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' (১জুন, ১৮৮৩) লেখেন—

"গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা"। ইহা অভিনব মাসিক সমাচারপত্রিকা। গত বৈশাখ মাস অবধি কলিকাতা অপর সর্কিউলার রোড বাহির মৃজাপুরের শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যারত্ন যন্ত্র' হইতে প্রচারিত হইতেছে।

কুমারখালিনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ মজুমদার ইহার সম্পাদক। গ্রামের বৃত্তান্তাদি বাহুল্যরূপে ইহাতে লিখিত হইবে। আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। পাঠ করিয়া দেখা গেল লেখা মন্দ হইতেছে না। ইহাতে গদ্য ও পদ্য আছে। সম্পাদক যদি পরিশ্রম করিয়া লেখেন, তাহা হইলে ইহার উন্নতি হইতে পারে। ইহার মাসিক মূল্য পাঁচ আনা, বার্ষিক ৩ টাকা।"

'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত, শ্লোকটি গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের রচিত :

"গুণালোকপ্রদা দোষ-প্রদোষ-ধ্বান্ত-চন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা ॥"

১২৭৬ সালের বৈশাখ মাস হইতে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র একটি পাক্ষিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়। ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে পাক্ষিক পত্র সাপ্তাহিকে পরিণত হয়।

'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পরিচালনা করিয়া কাঙ্গাল হরিনাথ ঋণগ্রস্ত হন। এই কারণে নয় বৎসর কায়ক্লেশে কাগজখানি চালাইবার পর তিনি উহার প্রচার বন্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু সহৃদয় বন্ধুরা চাঁদা করিয়া কাগজখানি বজায় রাখেন। ১২৮০ সালের ৬ই বৈশাখ (১৭ এপ্রিল ১৮৭৩) তারিখে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা গত সংখ্যক গ্রামবার্ত্তা পত্রিকা পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। গ্রামবার্ত্তার সম্পাদক আজ কয়েক বৎসর শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক নানা কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক এই পত্রিকাখানি চালান। ক্রমে ঋণগ্রস্ত হন এবং আপাততঃ তিনি ঋণভারে এরূপ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়েন যে, কাগজখানি বন্ধ করার সংকল্প করেন এবং পত্রিকায় সেইরূপ প্রকাশ করেন। কিন্তু ১লা বৈশাখে তিনি পত্রিকা সম্বন্ধে নিজ গৃহে

একটি উৎসব করিয়া থাকেন। এবার সেই উপলক্ষে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের নিকট পত্রিকা রহিত করিবার প্রস্তাব করায়, তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং একটি চাঁদা করিয়া পত্রিকাখানি আপাততঃ রাখিয়াছেন। গ্রামবার্ত্তার সম্পাদক কুমারখালীতে একটি যন্ত্রালয় [স্থাপন করিবার] উদ্যোগ করিতেছেন।"

এই সংখ্যা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একখানি "প্রেরিত পত্রে" প্রকাশ :

"কুমারখালি—প্রতিবাদ।···গতকল্য গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকার সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। সাপ্তাহিক কাগজ বন্ধ হইবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহার সমস্ত ব্যয় চালাইতে স্বীকার করায়, সকল সভ্যগণে সেই ভার কুলাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।...কেষাঞ্চিৎ কুমারখালীবাসিনাম্।"

১২৮০ সালের প্রারম্ভে কাঙ্গাল হরিনাথ কুমারখালিতে একটি মুদ্রাযন্ত্র (মথুরানাথ-যন্ত্র) স্থাপন করেন, অতঃপর ঐ মুদ্রাযন্ত্র হইতেই 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' মুদ্রিত হইতে থাকে। ১২৮০সালের ১৭ই শ্রাবণ তারিখে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশ :—

"সংবাদ।···আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে কুমারখালিতে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং তত্রত্য স্থানীয় সম্বাদপত্র 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা' উক্ত যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে।"

১২৮১ সালের মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা'র বৈশাখ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় "১২ ভাগ—১ম সংখ্যা" লেখা আছে ; জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার উপর লেখা আছে "১২ ভাগ—২য় সংখ্যা"। তবে পরবর্ত্তী বৎসরের প্রথম কয়েক মাস পত্রিকা যথারীতি প্রকাশিত না হওয়ায়, ১২৮২ সালের আশ্বিন সংখ্যায়

লেখা আছে "১৩ ভাগ—১ম সংখ্যা"। ঐ সংখ্যার সম্পাদক কৈফিয়ত দিতেছেন :

"গত বৎসর নানা বিপদে বিপন্ন হইয়া গ্রামবার্ত্তা মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করে। তাহার তাদৃশী অবস্থাবলোকনে অনেক গ্রাহক নিদয় হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন এবং অনেক দাতা তাহার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। কেবল দীনপালিনী শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার সাহায্য-দানের উপর নির্ভর করিয়া, সে জীবন রক্ষা করিয়াছে। অন্যথা এতদিন তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিত না।··· ··· আমরা নানা কারণে আশ্বিন মাস হইতে মাসিক গ্রামবার্ত্তার নূতন বৎসর আরম্ভ করিলাম।"

এই ভাবে পত্রিকা দুই বৎসর চলে। তাহার পর পুনরায় বৈশাখ হইতে উহার বৎসর গণনা করা হয়।

মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা'র বয়স উনবিংশ বৎসর পূর্ণ হয় ১২৮৮ সালের চৈত্র মাসে। ১২৮৯ সালের বৈশাখ হইতে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। সম্পাদক মহাশয় ১২৮৮ সালের চৈত্র সংখ্যায় গ্রাহকগণকে জানাইতেছেন :

"গ্রাহকগণ! অনুগ্রহপ্রকাশে আমাদিগের মাসিক গ্রামবার্ত্তার প্রাপ্য মূল্যগুলি সত্বরে প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে ঋণজাল হইতে মুক্ত করিবেন। মাসিক গ্রামবার্ত্তা যে এই হইতে বন্ধ হইল, ইহার কারণ গ্রাহকাদগকে পূর্ব্বেই জ্ঞাত করা হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিতে আর ইচ্ছা করি না। তবে গ্রাহকগণ রীতিমত সময়ে গ্রামবার্ত্তার দেয় মূল্য না দেওয়াই যে বন্ধ হইবার প্রধান কারণ, তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।"

সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা'র প্রচার প্রথম বন্ধ হয় ১২৮৬ সালে। ১২৮৭

সালের বৈশাখ সংখ্যা মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা'র গোড়ায় সম্পাদক লিখিতেছেন :

"নানা কারণে মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকা বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু কখন সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধ হয় নাই,—দুর্ভাগ্যবশতঃ গত বৎসর তাহাও সংঘটিত হইয়াছে। এক দিকে ভারতাকাশে মুদ্রাশাসনী ব্যবস্থার জন্য উদ্যত বজ্রের ন্যায় গর্জ্জন * এবং তচ্ছ্রবণে 'বঙ্গভাষার সংবাদপত্র কেবল সাক্ষীগোপাল মনে করিয়া', অন্যদিকে তাহার প্রতি লোকের অমনোযোগ, গ্রাহকগণের মূল্য প্রদানে ঔদাসীন্য অবলম্বন, নানা চিন্তায় উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া সম্পাদকের শয্যাশ্রয় ইত্যাদি ঘটনাসমূহ সাপ্তাহিক গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইবার কারণ।... গ্রামবার্ত্তার কতিপয় সহৃদয় বন্ধু সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারের নিমিত্ত বিবিধ প্রকারে যত্ন করিতেছেন। যদি তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহা হইলে সত্বরেই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে, অন্যথা তাহার জীবনাশা আর নাই।"

মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা' বন্ধ হইলে, ১২৮৯ সালের বৈশাখ মাস হইতে সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা' পুনঃপ্রকাশিত হইতে লাগিল—'গ্রামবার্ত্তা'র দরদী বান্ধবগণের যত্ন ও চেষ্টায়। তখন ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন রায় বাহাদুর জলধর সেন ও ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। এই সাপ্তাহিক সংস্করণ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় ১২৯২ সালে আশ্বিন মাসে।

কাঙ্গাল হরিনাথের অপ্রকাশিত ডায়েরীতে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ পাওয়া যায়, তাহার সবটুকু উদ্ধৃত করা হইল :

"আমি শুনিলাম, বাংলা সংবাদপত্রের অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেন্ট তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত একটি কার্য্যালয়ও

---

* বড়লাট লর্ড লিটনের শাসনকালে

স্থাপিত হইবে। 'ঘরে নাই এক কড়া, তবু নাচে গায় পড়া'। আমার ইচ্ছা হইল, এই সময় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিয়া, গ্রামবাসী প্রজারা যে যে ভাবে অত্যাচারিত হইতেছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ণগত করিলে, অবশ্যই তাহার প্রতিকার এবং তাহাদিগের নানা প্রকার উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রাম ও গ্রামবাসী প্রজার অবস্থা প্রকাশ করিবে বলিয়া পত্রিকার নাম 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' রাখিয়া গিরিশযন্ত্রের কর্ত্তা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে একটি শিরোমুকুট অর্থাৎ হেডিং আর একটি শ্লোক প্রস্তুত করাইলাম॥ (১৯২৪ পৃঃ)

"কুমারখালী বাঙ্গলা পাঠশালার যে ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় নর্ম্মাল স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পুলিনচন্দ্র সিংহ দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করায়, (প্রধান শিক্ষক আমি) আমার শ্রম অনেক লাঘব হইল। উক্ত পাঠশালার যে যে ছাত্র তখন নিজ নিজ পৈতৃক বিষয়কার্য্য করিয়া উন্নতিপ্রদর্শনে প্রশংসালাভ করিতেছেন, সেই কৈলাসচন্দ্র প্রামাণিক ও গোবিন্দচন্দ্র চাকীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অবধারিত করিলাম, তাঁহারা মূলধন সংগ্রহ করিয়া একটি পুস্তকালয় স্থাপন করিবেন। উক্ত পুস্তকালয় হইতে সম্বাদপত্রিকা গ্রামবার্ত্তাও প্রকাশিত হইবে। আমি পত্রিকার সম্পাদক হইয়া এবং নিজ স্কন্ধে দায়িত্ব রাখিয়া লিখিবার ভার বহন করিব। কিন্তু আর্থিক ক্ষতিবৃদ্ধির নিমিত্ত দায়ী হইব না, পুস্তকালয় যেমন লাভগ্রহণ তদ্রূপ ক্ষতিও স্বীকার করিবে। যদি পুস্তকালয় পত্রিকার নিমিত্ত বিশেষ লাভবান হয়, তবে আমি তখন ভাতাস্বরূপ কিছু কিছু পাইব। (১৪২৫-২৬ পৃঃ)

" 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' সংবাদপত্রিকার দ্বারা গ্রামের অত্যাচার নিবারিত ও নানা প্রকারে গ্রামবাসীদিগের উপকার সাধিত হইবে এবং তৎসঙ্গে মাতা বঙ্গভাষাও সেবিতা হইবেন, ইত্যাদি নানা প্রকার আশা

করিয়া পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষদিগের উক্ত নিয়মে অগত্যা বাধ্য হইয়া 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র কার্য্য আরম্ভ করিলাম। ১২৭০ বারশত সত্তর সাল, বৈশাখ মাসে কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রথমতঃ মাসে একবার চারি ফর্ম্মা করিয়া 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র প্রচার আরম্ভ হইল। প্রথম বৎসর লাভ দেখিয়া দ্বিতীয় বৎসর পুস্তকালয় গ্রামবার্ত্তার ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকার করিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে ক্ষতি হইল দেখিয়া তাহার অধ্যক্ষরা তৃতীয় বৎসরে পুস্তকালয়ের কার্য্য বন্ধ করিলেন, সুতরাং 'গ্রামবার্ত্তা' প্রচারের উপায়ও তৎসঙ্গে বন্ধ হইল। সংবাদপত্র লিখিয়া লাভবান হইব, আমি এই ইচ্ছায় তাহার কার্য্যভার গ্রহণ করি নাই। সুতরাং লাভ না দেখিয়া লাভাভিলাষী পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষগণের ন্যায় গ্রামবার্ত্তা প্রচারের ইচ্ছা আমার সঙ্কোচিত হইল না, বরং আরও বলবতী হইয়া আমি উক্ত অনিবারণী ইচ্ছার অনুগামী হইয়া নিজেই তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে কৃতসংকল্প হইলাম এবং লজ্জা ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ধারণ করিলাম। পুস্তকালয়ের সাহায্যে দুই বৎসর গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে 'গ্রামবার্ত্তা' এবং তৎব্যতীত 'চারুচরিত্র' নামক একখানি পুস্তক ছাপা করিয়া আমি তাঁহার নিকট পরিচিত ও বিশ্বস্ত হইয়াছি। সুতরাং তৃতীয় বৎসরের নিমিত্ত গ্রামবার্ত্তার কার্য্য আরম্ভ করিতে আশু টাকার প্রয়োজন হইল না।...[১৪২৭-২৮ পৃঃ]

"গ্রামবার্ত্তার প্রবন্ধাদি এবং আগত পত্রে সংবাদাদি বিচার ও সংশোধন করিয়া চারি ফরমার উপযুক্ত আদর্শলিপি অর্থাৎ কাপি হাতে লিখিয়া যথাসময়ে যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করা অল্প সময়ের প্রয়োজন নহে, ইহার পর মূল্যাদি আদায় ও অন্যান্য কারণে [১৪৩০ পৃঃ] এবং পত্রপ্রেরক প্রভৃতি নানা লোকের নিকট পত্রাদিও সর্ব্বদা লিখিতে ও নিজের স্ত্রীপুত্রাদির রক্ষণাবেক্ষণ সাংসারিক কার্য্য প্রভৃতিতেও অনেক সময়ের আবশ্যক

হইত।...অতএব আমি শ্যাম ও কুল উভয় রক্ষা করিতে না পারিয়া... পাঠশালার কার্য্যরূপে মাতৃভাষার সেবা হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম এবং গ্রামবার্ত্তা প্রচারে গ্রামবাসী ও মাতৃভাষার সেবা করিতে ব্রতপরায়ণ হইলাম। জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত পাঠ্যপুস্তকাদি বিক্রয়ের পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলাম [১৪৩২ পৃঃ]

"আমি এইরূপে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশের দ্বারা গ্রামবাসী ও গ্রামবার্ত্তার সেবা করিতেছি। গ্রামবার্ত্তার তৃতীয় বৎসর অনায়াসে অতিবাহিত হইল। চতুর্থ বৎসরে পত্রদ্বারা অবস্থা অবগত করিয়া গ্রাহকগণের নিকট প্রাপ্য মূল্য আদায় ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিল। এক দিন, দুই দিনের দূরবর্ত্তী স্থানে নিজেই গমন করিয়া মূল্য আদায় করিতে লাগিলাম। তৎসঙ্গে দুই একজন গ্রামবৎসল ব্যক্তি নূতন গ্রাহকও হইতে লাগিলেন। আমিই লেখক, আমিই সম্পাদক, আমিই পত্রিকার লেফাফা লেখক ও বিলিকারক এবং আমিই মূল্য আদায়কারী। দীনজনের দীনতার দিন এইভাবে দিন দিন গত হইতেছে। [১৪৩৯ পৃঃ]

"...এতদিনে ক্রমান্বয়ে অনেকে বুঝিতে পারিলেন, পূর্ব্বে অনেক ধনবানাদি সবল লোকেরা দুর্ব্বলের প্রতি প্রকাশ্যরূপে সহসা যে প্রকার অত্যাচার করিতেন, এক্ষণে যে তদ্রূপ করিতে সাহসী হইতেছেন না ·· 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'ই তাহার কারণ। অতএব ন্যায়বান্ কতিপয় গ্রামবাসী গ্রামবার্ত্তার উন্নতির নিমিত্ত একটি ভবন-সভা করিয়া মাসিক গ্রামবার্ত্তাকে পাক্ষিকরূপে প্রকাশ করিতে বলিলেন এবং আপনারা সাধ্যানুসারে দুইশত হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত একদা দান অঙ্গীকারপূর্ব্বক দানপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। আমি তাঁহাদিগের আদেশ অনুসারে · ··· [১২৭৪ ?] সালের বৈশাখ মাস হইতে 'গ্রামবার্ত্তা' পক্ষান্তরে প্রচারের করিয়া তাহার কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলাম। [১৪৪২ পৃঃ] গ্রাম

দুইমাস গত হইল কেহই টাকা আদায় করিলেন না। আমি ঘোর বিপদে পতিত হইয়া "কিরূপে গ্রামবার্ত্তার জীবন রক্ষা হইবে" অন্যমনস্ক হইয়া দিবারাত্রি যে প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্ত চিন্তা করিলে তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারিতাম, সন্দেহ নাই।... কুমারখালীনিবাসী রাধাগোবিন্দ মজুমদারের নিকট হইতে ১০০৲ একশত টাকা হাওলাত লইয়া উপস্থিত বিপদের আশু প্রতিকার করিলাম। কতক দিন পরে যিনি ২০০৲ দুইশত টাকা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তিনি একশত আদায় করিলে আশু ঋণ পরিশোধিত হইল। কিন্তু এই একশত টাকা ব্যতীত, যিনি ২০০৲ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, [১৪৪৩ পৃঃ] তিনি যেমন অবশিষ্ট টাকা দিলেন না, তদ্রূপ অন্য স্বাক্ষরকারিগণ বিন্দুবিসর্গও আদায় করিলেন না। সুতরাং কিরূপে গ্রামবার্ত্তার জীবন থাকিবে, এই এক বৎসর সেই চিন্তায় অনেক রাত্রি অনিদ্রায় গত হইতে লাগিল। উক্ত প্রকার চিন্তার পর, কোথা হইতে কোন্ বিষয়ে কি প্রকারে প্রয়োজন সাধন হইয়া গ্রামবার্ত্তার জীবন রক্ষা করিয়াছে, সে সমুদায় ধারাবাহিকরূপে এক্ষণে আমার স্মরণ নাই। তবে এস্থলে কেবল এই মাত্র বলিতেছি, গ্রামবাসীদিগের-হিতৈষী অনেক ধনাঢ্য লোকের বার্ষিক ও একদা দানে পাক্ষিকের পর 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে সাপ্তাহিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। যখন গ্রামবার্ত্তা মাসিক ছিল, তখন ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি সাহিত্যময় প্রবন্ধ এবং রাজনীতিময় প্রস্তাব, গ্রামের ঘটনা সম্বাদ সহকারে গ্রামবাসীদিগের জ্ঞাতব্য রাজার অভিপ্রায়, মন্তব্য ও বিবিধ সংবাদ প্রকাশিত হইত। পাক্ষিকাবস্থায় ধর্ম্মনীতি-সাহিত্য ব্যতীত পূর্ব্ববৎ আর সকলেরই [১৪৪৪ পৃঃ] প্রচার হইয়াছে। সাপ্তাহিকাবস্থার সাহিত্যময় প্রবন্ধাদি প্রচার রহিত হইয়া বাহুল্যরূপে রাজনীতিরই আলোচনা হইতে লাগিল।

কিন্তু সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানাদি আলোচনার নিমিত্ত স্বতন্ত্ররূপে একখানি মাসিক গ্রামবার্ত্তাও প্রকাশিত হইত। [১৪৫৫ পৃঃ] .. ...

"কেবল সংবাদদাতা, পত্রপ্রেরক ও শ্রুতিকথার প্রতি নির্ভর করিয়া গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিত হইত না। আমরা গ্রামবার্ত্তার উপযুক্ত বার্ত্তা জানিবার নিমিত্ত কখনও গোপনে, কখনও প্রকাশ্যে নানা স্থান পরিদর্শন ও দূরস্থ গ্রামপল্লী অবসরমত সময়ে সময়ে ভ্রমণ করিয়াছি এবং এই প্রকার ভ্রমণ করিয়া শান্তিপুর, উলাদি উপনগর পরিদর্শনে তাহার নামোৎপত্তির কারণ ও প্রাচীন বৃত্তান্ত এবং মেহেরপুর, চাকদহ ও উলা প্রভৃতি স্থানের মহামারীর অবস্থা অনেক সংগ্রহ করিয়াছিলাম। উক্ত উপায়ে নিজে যাহা সংগ্রহ করি ও হিমালয় প্রভৃতি নানা দিক্‌ দর্শন করিয়া ভ্রমণকারিগণ যাহা সংগ্রহ করিতেন, তাহা সমস্তই মাসিক গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত হইত। নানা প্রদেশের ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত হইয়া গ্রাম ও পল্লীবাসীদিগের যতদূর উপকার সাধন করিয়াছিল, আমি ততদূর অত্যাচারী লোকের বিষনেত্রে পড়িয়া নানা প্রকারে উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইতে লাগিলাম। [১৪৬২-৩) ...

"চারিদিকে পুস্তকবিক্রয়ের দোকান যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, আমার জীবিকাস্বরূপ পুস্তকালয়ের আয় ক্রমে অল্প হইয়া আসিল। যদি গ্রামবার্ত্তার প্রতি উক্ত ভার অর্পণ করি, তবে সে চলিতে পারে না, নিজের ভার নিজে বহন করিবারও আর কোন প্রকার উপায় নাই।...এই সময়ে রংপুর তুষভাণ্ডারের রাজা রমণীমোহন রায়চৌধুরীর দান [মাসিক ১০৲] রহিত হওয়ায় মাসিক গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইয়াছিল [১৪৯১ পৃঃ]...

"রাজীবলোচন মজুমদার আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ সারগ্রাহী পরম বৈষ্ণব কুঞ্জবিহারী মজুমদারের প্রপৌত্র। রাজীবলোচন মজুমদার আমার ছাত্র কৃষ্ণচন্দ্র মৈত্রের মুখে শুনিয়াছিলেন, একটি প্রেস অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্র

হইলে কুমারখালীর সংবাদপত্রিকা 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' ইহা অপেক্ষা ভালভাবে চলিতে পারে এবং উক্ত প্রেস ধরিয়া আমাদিগের ন্যায় অন্যূন সাত আটটি পরিবার অনায়াসে অন্ন সংগ্রহ করিতে পারে। তিনি বৃন্দাবন-গমনের সময় কলিকাতায় কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। [১৬৭৩ পৃঃ] সেই সময় গ্রামবার্ত্তার প্রেস ক্রয় করিতে আমার নিমিত্ত ৬০০৲ ছয়শত টাকা···আমার খুড়া নবীনচন্দ্র সাহার নিকটে রাখিয়া গিয়াছিলেন।...উক্ত টাকায় প্রেস করিবার নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে পত্র লিখিয়া তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তদুত্তরে তিনি লিখিলেন, "উক্ত টাকায় প্রেস করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে দান করিয়াছি। তুমি প্রেস স্থাপন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের কথানুসারে যত জন নিরন্ন দুঃখী পরিবার প্রতিপালিত এবং ভালরূপে গ্রামবার্ত্তার কার্য্য চালাইতে পারিবে, আমি তোমার প্রতি ততই সন্তুষ্ট হইব।" আমি উক্ত পত্রানুসারে টাকার অধিকারী হইলে [১৬৭৪ পৃঃ] 'মথুরানাথ-যন্ত্র' নামে এই বর্ত্তমান প্রেসটি, তৎকালে কলিকাতাস্থ বন্ধুগণ ক্রয় করিয়া পাঠান। [১৬৭৫ পৃঃ]···

"আমি প্রেসস্থাপন ও তাহা হইতে 'গ্রামবার্ত্তা' প্রকাশ এবং নিজ পরিবার ও প্রেসের কর্ম্মচারী অন্য ৬।৭টি পরিবারের অন্নসংগ্রহ করিয়া খুড়া রাজীবলোচন মজুমদারের আদেশ পালন করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার অর্থকৃচ্ছ্রতা পূর্ব্বে যেমন ছিল, তাহা অপেক্ষা বরং ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পূর্ব্বে কেবল গ্রামবার্ত্তার নিমিত্ত চিন্তা ছিল, এখন তদ্‌সঙ্গে প্রেস চালাইবার চিন্তা উপস্থিত হইল। [১৬৮১ পৃঃ]

"আমি প্রেসস্থাপন ও কতিপয় বৎসর গ্রামবার্ত্তার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ক্রমেই ঋণগ্রস্ত হইতে লাগিলাম,—দেখিয়া আমার ছাত্র কুমারখালীর বাঙ্গলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্য

কয়েকজন বন্ধুবান্ধব, আমার হস্ত হইতে 'গ্রামবার্ত্তা' গ্রহণ এবং তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কয়েক বৎসর কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, আমি কাগজপত্র আলোচনা করিয়া দেখিলাম, পূর্ব্ব ও পরে একত্রিত হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ১২০০৲ বারশত টাকা ঋণ হইয়াছে। এদিকে আমার শরীর ক্রমেই বার্দ্ধক্য জরার নিকটবর্ত্তী হইতেছে। অতএব, আর ঋণবৃদ্ধি হওয়া উচিত হয় না মনে করিয়া গ্রামবার্ত্তার কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলাম। [১৬৮৪ পৃঃ]"

শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ কাঙাল হরিনাথের স্বহস্ত-লিখিত ডায়েরী থেকে কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করেছেন! কাঙালের এই বিস্তৃত ডায়েরী আমাদের এক অমূল্য সম্পদ্। কিন্তু সেই ডায়েরী আদ্যোপান্ত প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। তাহাতে নানা বিপদ-আপদের সম্ভাবনা আছে। সেই কারণে কাঙালের ডায়েরী তাঁর পরলোকগমনের পর এই সুদীর্ঘকাল অপ্রকাশিত অবস্থায় প'ড়েই রয়েছে। আমরা কেউই সেই ডায়েরী আমূল প্রকাশের চেষ্টা করিনি এবং ভবিষ্যতেও করব না। সেই ডায়েরীতে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' সম্বন্ধে যে কথাগুলি আছে, শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ অনেক স্থল বাদ দিয়া প্রকাশ করেছেন।

ঐ ডায়েরী-উদ্ধৃত অংশের শেষ দিকে তিনি বলেছেন, 'পণ্ডিত প্রসন্ন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও দু'একজন বন্ধু 'গ্রামবার্ত্তার' শেষ ভার গ্রহণ করেছিলেন।' সেই আরও দু'একজন বন্ধুর মধ্যে আমিও একজন। আমি তখন গোয়ালন্দে মাষ্টারী করি। "গ্রামবার্ত্তা"র যা কিছু কাজ, পূজনীয় প্রসন্ন পণ্ডিত মশাই করতেন। আমি প্রতি শনিবার রাত্রে গোয়ালন্দ মেলে কুমারখালিতে আসতাম, পরদিন রবিবারে পণ্ডিত মহাশয়কে যথাসাধ্য সাহায্য করতাম। পণ্ডিত মহাশয় সম্পাদক পদ

গ্রহণ করতে কিছুতেই সম্মত হননি। তাই শেষের দু'বছর আমার নামই সম্পাদক হিসাবে ছিল। কাজ যা কিছু পণ্ডিত মহাশয়ই করতেন—এবং গ্রীষ্মাবকাশের সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় যখন বাড়ীতে থাকিতেন তখন তাঁর মূল্যবান্ সাহায্য পণ্ডিত মহাশয় পেতেন।

এইখানে আর একটী কথার উল্লেখ করে'ই "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা"র সঙ্গে আমার সম্বন্ধের কথা শেষ করব। আমি যখন "গ্রামবার্ত্তা"র তথাকথিত সম্পাদক, তখন রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপণ এদেশ ত্যাগ করে' যান। তিনি দার্জ্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কলিকাতায় ফিরে এসেই দেশে চলে যান।

যে দিন তিনি দার্জ্জিলিং থেকে কলিকাতায় যান, সেদিন আমরা একটা গান ছাপিয়ে নিয়ে সদল-বলে পোড়াদহ ষ্টেশনে যাই। লাট সাহেবের স্পেশাল ট্রেণ পোড়াদহে দু'মিনিট থামবার কথা—কিন্তু গাড়ী পৌছতে না পৌছতেই, আমরা প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে সেই গান গাইতে আরম্ভ করি। স্পেশাল ট্রেণের সাহেবরা, হয়ত লাট সাহেব স্বয়ংও গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে, এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখতে থাকেন। তাতে স্পেশাল ট্রেণ আরও তিন মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা গানটী বাংলায় ছাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং তার ইংরাজী অনুবাদও ছাপিয়েছিলাম। স্পেশাল ট্রেণের প্রত্যেক কামরায় সেই ইংরাজী-বাংলা-ছাপানো কাগজ আমরা ১৫।২০ খানা ফেলে দিয়েছিলাম। তার পরদিনই আমি কলিকাতায় গিয়ে একখানি আবেদনপত্রের সঙ্গে ছাপান গান গেঁথে নিয়ে গবর্ণমেণ্ট হাউসে গিয়ে বড়লাট বাহাদুরের চীফ্ সেক্রেটারির নিকট পাঠাই।

কয়েকদিন পরেই প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করে' আমাদের সেই পত্রের উত্তর দেন। নিম্নে সেই

বাংলা গানটী উদ্ধৃত করে' দেবার প্রলোভন আমি সম্বরণ করতে পারলাম না।

"দেশে চলিলে মহামতি রিপণ!
রাম-রাজ্য-সম প্রজা করিয়ে পালন।

১। সুশাসনে এ ভারতে, ছিল প্রজা নিরাপদে
(তব ন্যায়পরতায়, সাম্যনীতি)
তোমার বিরহে কাঁদে নরনারীগণ।

২। আমরা কাঙ্গাল বেশে, এসেছি তব উদ্দেশে,
(হের কৃপানয়নে, সাধারণ দেশের দশা)
দেশের দশা প্রকাশ বেশে কর নিরীক্ষণ।

৩। হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, দেখাতে নাহি ক্ষমতা,
(আমরা পল্লীবাসী হে), (জ্ঞান-অর্থহীন)
(ধর চক্ষের জল হে), (অন্য সম্বল নাই)
রাজভক্তি সরলতা ভারতবাসীর ধন।

৪। ভিক্টোরিয়া মাতা যখন, জিজ্ঞাসিবে বল তখন।
(কেবল নাম রয়েছে, সোনার ভারত)
(সকল হারায়েছে)
সোণার খনি নাই আর এখন ভারত-ভুবন!

৫। দুর্ভিক্ষ প্রতি বছরে, অন্ন বিনা প্রজা মরে,
(মায়ের কাছে বল এই, ভিক্টোরিয়া)
ম্যালেরিয়া মহাজ্বরে নাশে প্রজাগণ।

৬। সহায়হীনা গুরুরমণি, পরম সতীরমণী,
(তার কি দশা হল হায়!) (বল্‌তে হৃদয় ফাটে)
হারিয়ে সতীত্বমণি বধিল জীবন।

৭। আর যত অত্যাচার, সকলি তব গোচর,
(কিবা নিবেদিব হে, তুমি সকল জান)
দেশে গিয়ে গুণাকর, করিবে স্মরণ।

৮। ভারতের কপাল মন্দ, অস্ত্রাইনে হস্ত বন্ধ,
(তাদের এ কি দশা হে) (মহারাণীর প্রজা হয়ে)
পশুহস্তে প্রজাবৃন্দ হারায় জীবন।

৯। রাজরাজেশ্বরী হয়ে, থাকুক মাতা ভিক্টোরিয়া,
(প্রার্থনা করি এই বিভুপদে)
এ অত্যাচার দয়া করে' করুন নিবারণ।

১০। তিনি তোমায় করুন রক্ষে, স্থলে জলে, অন্তরীক্ষে,
(যিনি আত্মাতে আত্মাতে, এ চরাচরের)
কাঙ্গাল ফিকিরের এই ভিক্ষে, কাতর নিবেদন।

এই খানে ফিকিরচাঁদ ফকিরের বাউলের দলের একটু বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করছি (১৭—২৯ পৃষ্ঠা)।

একবার গ্রীষ্মের অবকাশের সময়ে শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ভায়া বাড়ীতে (কুমারখালিতে) আসিয়াছেন। তিনি তখন বি-এল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। আমি তখন স্কুল-মাষ্টার। আমারও গ্রীষ্মাবকাশ। আমরা তখম বাড়ীতে আসিয়া কাঙ্গালের বড় সাধের 'গ্রামবার্ত্তা প্রবেশিকা' পত্রিকার সম্পাদন করি, আর অবসর সময়ে আমোদ-আহ্লাদে কাটাইয়া দিই।

এই সময়ে একদিন মধ্যাহ্নকালে গ্রীষ্মের জ্বালায় অস্থির হইয়া, 'গ্রামবার্ত্তা'র কাপি লেখা পরিত্যাগ করিয়া, আমরা হাত-পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছি। স্থান 'গ্রামবার্ত্তা'র অফিস অর্থাৎ কাঙ্গাল হরিনাথের চণ্ডীমণ্ডপের একটী কক্ষ। উপস্থিত শ্রীমান অক্ষয়কুমার, 'গ্রামবার্ত্তা'র

প্রিণ্টার (এক্ষণে পরলোকগত) প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কুমারখালি বাঙ্গালা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ছাপাখানার ভূতের দল। ভূতেরা ব্যাকরণে বা সাহিত্যে পণ্ডিত ছিল না। কিন্তু তাহারা সকলেই কাঙ্গালের শিষ্য। সকলেই গান করিতে পারিত। চুপ করিয়া থাকা আমাদের কাহারও কোষ্ঠীতে লেখে না। সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে কি করা যায়, ইহা লইয়াই তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইল। তর্ক বেশ চলিতে লাগিল, কিন্তু কর্ত্তব্য স্থির হইল না; তর্কের যাহা গতি হইয়া থাকে, তাহাই হইল। অক্ষয় বলিলেন যে, "একটা বাউলের দল করিলে হয় না!" এ কথাটা মনে হইবারও একটা কারণ ঘটিয়াছিল। সেদিন প্রাতঃকালে লালন ফকির নামক একজন ফকির কাঙ্গালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। লালন ফকির কুমারখালির অদূরবর্ত্তী কালীগঙ্গার তীরে বাস করিতেন। তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল। তিনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাহা বলা বড় কঠিন; কারণ তিনি সকল সম্প্রদায়ের অতীত রাজ্যে পৌছিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতা করিতেন না, ধর্ম্মকথাও বলিতেন না। তাঁহার এক অমোঘ অস্ত্র ছিল, তাহা বাউলের গান। তিনি সেই সকল গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। শুনিয়াছি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহের কুটিতে লালন ফকির একবার গান করিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাহ্ন তিনটা পর্য্যন্ত গান চলিয়াছিল; ইহার মধ্যে কেহ স্থান ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সেই লালন ফকির কাঙ্গালের কুটীরে, আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেইদিনই আসিয়াছিলেন এবং কয়েকটী গান করিয়াছিলেন। সব কয়টী গান এখন আর আমার সঠিকভাবে মনে নাই; একটী গান মনে আছে, যথা—

"আমি একদিনও না দেখিলাম তারে ;
আমার ঘরের কাছে আরসী-নগর,
তাতে এক পড়সী বসত করে।
গ্রাম বেড়ে অগাধ পাণি,
তার নাই কিনারা, নাই তরণী পারের ;
আমি মনে দেখ্‌ব তারি,
আমি কেমনে সেথা যাই রে !
বলব কি পড়সীর কথা তার,
হস্ত, পদ, স্কন্ধ কিছুই নাই রে ;
সে যে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর,
আবার ক্ষণেক থাকে নীরে।
সেই পড়সী যদি আমার হ'ত
তবে যম-যাতনা সকল যেত দূরে ;
আবার, সেই আর লালন এক স্থানেই রয়,
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে ॥"

প্রাতঃকালে যখন গান হয়, তখন আমরাও সেখানে উপস্থিত ছিলাম, গানও শুনিয়াছিলাম ; কিন্তু আমরা সে গানের মর্ম্ম ধরিতে পারিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে শ্রীমান্ অক্ষয়ের মনে হয়ত হঠাৎ সেই লালন ফকিরের গানের কথা উদিত হইয়াছিল। তাই সে বলিয়া বসিল "একটা বাউলের দল করিলে হয় না ?" সকলেই তখন বলিয়া উঠিলেন "বেশ, বেশ !"

"বেশ, বেশ" বলাটা খুব সহজ ; কিন্তু গান কোথায় ? বাউলের গান তখন তেমন প্রচলিত হয় নাই। ক্বচিৎ কখনও দুই একজন ফকির বা দরবেশের মুখে এক আধটা দেহতত্ত্বের গান আমরা শুনিয়াছি। সে

সকল গান কাহারও মনে ছিল না। পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বলিলেন "নূতন করিয়া গান প্রস্তুত করিতে হইবে।" শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার না পারেন, এমন কার্য্যই নাই। তখনও তিনি যেমন ছিলেন এখনও তাই। বয়সের পরিণতিতে সে ভাবটা এখনও যায় নাই। তিনি যাহা ধরেন, তাহাই করিতে পারেন। অক্ষয়কুমার বলিলেন, "তার জন্য ভয় কি? ধর্ত জলদা, কাগজ; বাউলের গানই লেখা যাক্!" আমি তখন কাগজ-কলম লইয়া বসিলাম। 'গ্রামবার্ত্তা'র কাপি লিখিবার জন্য যে কাগজ গুছাইয়া বসিয়াছিলাম তাহারই শ্রাদ্ধ করিতে বসিলাম। অক্ষয়কুমার বলিলেন—

"ভাব মন দিবানিশি, অশিবনাশি,
সত্যপথের সেই ভাবনা।
যে পথে চোর-ডাকাতে কোনমতে,
ছোঁবে না রে সোণাদানা॥
সেই পথে মনোসাধে চল্‌রে পাগল,
ছাড়, ছাড় রে ছলনা।
সংসারের বাঁকাপথে দিনে রেতে,
চোর-ডাকাতে দেয় যাতনা;
আবার রে ছয়টা চোরে ঘুরে ফিরে
লয়রে কেড়ে সব সাধনা॥"

এই পর্য্যন্ত লেখা হলেই অক্ষয় বলিলেন, "এতদূর তো হল, তার পর?" তারপর—আবার কি? গানটা গাওয়া হবে। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "কথাটি বুঝলে না! বাউলের গানের নিয়ম হচ্ছে এই যে গানের শেষে একটা ভণিতা দিতে হয়। কেমন?" অক্ষয় বলিলেন, "সেই কথাই ত ভাবছি!" তখন এক এক জন এক একটা নাম বলিতে লাগিলেন।

কিন্তু কোনটাই 'ভোটে' টিকিল না। আমি বলিলাম, "অত লোকে কাজ কি! গানটি নিয়ে কাঙ্গালের কাছে যাই, তিনি শেষ অন্তরা এবং ভণিতা ঠিক ক'রে নেবেন।" অক্ষয় বলিলেন, "তা হবে না; তাঁকে একবারে Surprise (অবাক) করতে হবে। রও না, আমিই একটী নূতন নাম ঠিক করেছি।" এই বলিয়া একটু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন "লেখ জলদা"। আমি কলম ধরলাম, অক্ষয় শেষ অন্তরা ধরিলেন:

"ফিকির চাঁদ ফকির কয় তাই,
কি কর ভাই, মিছামিছি করি ভাবনা—
চল যাই সত্য পথে, কোন মতে,—
এ যাতনা আর রবে না।"

ব্যস্। গানের ভণিতা হইয়া গেল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন "ফিকির চাঁদ" নামটি ঠিকই হইয়াছে। আমাদের ত ধর্ম্মভাব ছিল না, কোনও "ফিকিরে" সময় কাটানই আমাদের উদ্দেশ্য। "ফিকির চাঁদ" নামের ইহাই ইতিহাস।

গানটা হইয়া গেল; তখন আমাদের মধ্যে পাকা ওস্তাদ প্রফুল্লচন্দ্র গানের সুর দিলেন। সুরটী নূতন কি পুরাতন, তাহা আমি বলিতে পারিব না। কিন্তু পুরাতন হইলেও, ঐ সুর বড়ই বাজিয়া উঠিল। পরে সমস্ত বাঙ্গালাদেশ ঐ সুরেই মাতিয়া উঠিয়াছিল।

সেই দ্বিপ্রহরে আমাদের মজ্‌লিসে যখন গানের রিহর্সেল দেওয়া শেষ হইল, তখন স্থির হইল গানটী একবার কাঙ্গালকে শুনাইতে হইবে। আমরা সকলে তখন দল বাঁধিয়া বাড়ীর মধ্যে কাঙ্গালের জীর্ণ খড়ের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন কি যেন লিখিতেছিলেন। এত বড় একটা রেজিমেণ্টকে অসময়ে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কি, তোদের আবার তর্ক বেঁধেছে নাকি! তোদের

জ্বালায় দেখছি একটু স্থির হইয়া কাজ করবারও যো নাই। কি ব্যাপার বল্‌ত?" তখন শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার আমাদের মুখপাত্রস্বরূপ (কারণ তিনি তখন বি, এল পড়েন, লায়েক হইয়াছেন) বলিলেন, "আমরা একটা বাউলের দল করব। তার জন্য একটা গান লিখছি।"

গানের কথা শুনিলে কাঙ্গাল শত রাজার ধন হাতে পাইতেন। তিনি অমনি পরম উৎসাহে বলিলেন "গান লিখেছিস্? সুর বসানো হয়েছে?" প্রফুল্ল বলিলেন "সব হয়েছে; এখন শুধু আপনার শোনা বাকি।" তখন তিনি বলিলেন "বেশ, বেশ; সকলে মিলে গা দেখি।" আমরা সকলে গান ধরলাম। গানের মুখটুকু তিনি বসিয়া বসিয়াই শুনিলেন; তারপর যখন অন্তরা ধরা হইল, তখন আর তিনি বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া পড়িলেন। আমরা ত দাঁড়াইয়াই আছি। তাহার পর গান আর নৃত্য—নৃত্য আর গান! সে এক অপার্থিব দৃশ্য!

শেষে গান থামিলে কাঙ্গাল বলিলেন—"দেখ, এই গানে দেশ ভেসে যাবে। তা' একটা গান নিয়ে ত আর বাহির হওয়া যায় না! আমিও একটা গান দিই। অক্ষয়, কাগজ-কলম ধর্ ত।"

তখন অক্ষয় কাগজ-কলম ধরিলেন। কাঙ্গাল প্রথমে একটু গুণ-গুণ করিয়া সুর ভাঁজিলেন; তারপর গাইতে লাগিলেন, অক্ষয় লিখিতে লাগিলেন:—

"আমি করব এ রাখালী কত কাল!
পালের ছটা গরু ছুটে' করছে আমায় হাল-বেহাল
আমি গাদা করে নাদা পুরে রে, কত যত্ন করে খোল বিচালী
খেতে দিয়ে ঘরে;
তারা ছটা যে গু-খেকো গরু রে; তারা নরক খায় রে হামেহাল।
কাঙ্গাল কাঁদে প্রভুর সাক্ষাতে, তোমার রাখালী নেও আর
পারিনে গরু চরাতে;
আমি আগে তোমার যা ছিলাম হে, তাই কর দীন-দয়াল।"

এইটী দ্বিতীয় গান। এই দুইটী গান লইয়া প্রথম প্রেসের ভূতেরা সন্ধ্যার সময়ে গ্রামের বাহির হইলেন। সেই নিদাঘের সন্ধ্যার সময়ে যখন আলখাল্লা পরিধান করিয়া, মুখে কৃত্রিম দাড়ী লাগাইয়া, নগ্নপদে গ্রামবার্ত্তার প্রেস হইতে ভূতের দল বাহির হইল এবং খঞ্জনী, একতারা ও গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গান ধরিল—

—"ভাব মন দিবানিশি"—

দুইটী গান লইয়া বাউলের দল প্রথমে বাহির হইল; কিন্তু দুইটী গানে লোকের পিপাসা মিটিল না; দুই তিন দিন যাইতে না যাইতেই কুমারখালী গ্রামের এবং নিকটবর্ত্তী কুড়ি-পঁচিশখানি গ্রামের আবালবৃদ্ধ গান দুইটী কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল। আমরা যখন যেখানে যাইতাম, শুধু শুনিতাম, কেহ গাহিতেছে—

"ভাব মন দিবানিশি"

অথবা আর কেহ গাহিতেছে—

"আমি করব এ রাখালী কত কাল।"

তখন শ্রীমান্ অক্ষয়কে আরও গান বাঁধিবার জন্য বলা হইল। অক্ষয় অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন "আমি আর বাঁধিব না; দেখিতেছ না এ গানে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। এখন 'কাঙ্গাল' ব্যতীত এ স্রোতের মুখে আর কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না! এখন ইহার পশ্চাতে সাধনার বল থাকা চাই, নতুবা চলিবে না।"

অক্ষয় যখন জবাব দিলেন, তখন আমাদের ভূতের দলের সর্দ্দার প্রসিদ্ধ গায়ক (এক্ষণে পরলোকগত) প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অগ্রসর হইলেন; তিনি বলিলেন "আমি গান বাঁধিব।" যে বলা, সেই কাজ। প্রফুল্ল গান গাহিতে পারিত। প্রেসের প্রিণ্টারের প্রাণে যে ভাবের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। প্রফুল্ল

পনর মিনিটের মধ্যে একটা গান বাঁধিয়া ফেলিলেন। আমরা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম; বুঝিলাম, তাঁহার কৃপা হইলে, অসম্ভবও সম্ভব হয়। প্রফুল্লের গানটা আমি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। গানটী এই—

"ভাবীদিন কি ভয়ঙ্কর, ভেবে একবার, দেখ রে আমার মন পামরা!

১। আত্মীয় ডাক্তার বদ্যি, নিরবধি, ঔষধ আদি দেবে তারা;
যখন তোর হাত ধরিতে, তর্জ্জনীতে, না করিবে নাড়াচাড়া।

২। যখন তোর সকল অঙ্গ অবশ হ'য়ে, প'ড়ে রবে ধরা;
যখন তোর আত্মলোকে, ডেকে ডুকে না পাইবে সাড়া।

৩। যে গলার মধুর স্বরে, জগতেরে মাতাস্ ওরে ঘাটে পড়া;
তখন তোর সেই স্বরেতে থেকে থেকে রব করিবে ঘড়াৎ-ঘড়া।

৪। তাই বলি, যাই দেখি চল্ সত্য পথে নিত্য-নগরেতে মোরা;
শুনেছি সেই ধামেতে এই রূপেতে মরে নারে মানুষ যারা।"

প্রফুল্লচন্দ্র এই গানটী রচনা করিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে কোন ভণিতা দিলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি আমার এই প্রথম গানে ভণিতা দিব না। এ-গান আমার রচনা নহে; আমার সাধ্য কি যে, আমি এই গান রচনা করি। যিনি আমার মুখ দিয়ে, আমার মত মহাপাপী ও দুশ্চরিত্রের মুখ দিয়ে এ গান বাহির করে দিয়েছেন, তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তবে ভণিতা দিবেন।" তাই এই গানটীর কোন ভণিতা নাই; কিন্তু তৃতীয় দিনে যখন এই গানটী লইয়া ফকিরের দল গ্রামে বাহির হইলেন, তখন এই গান শুনিয়া লোকে একেবারে অধীর হইয়া গেল। যে একবার শুনিল, সে দ্বিতীয়বার শুনিবার জন্য দলের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিল। কাঙ্গালের কুটীর হইতে গ্রামের দল বাহির হইয়া যখন বাজারে পৌছিল, তখন লোকারণ্য, দূর গ্রাম হইতে লোকেরা এই দলের

গান শুনিবার জন্য বেলা দ্বিপ্রহর হইতে আসিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। বাজারের উপর যখন এই গানটী আগাগোড়া গীত হইল, তখন কাহারও চক্ষু শুষ্ক ছিল না; সকলেরই প্রাণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। আমি অনেক দিন এমন জন-সমারোহ দেখি নাই। আর বলিতে কি এমন প্রাণস্পর্শী গানও আমি কখনও শুনি নাই। এখনও আমার নয়ন সম্মুখে সেই দৃশ্য বর্ত্তমান দেখিতেছি। সে আজকালকার কথা নহে। ফিকিরচাঁদ ফকিরের দল বাঙ্গালা ১২৮৭ সালে গঠিত হয়। আজ ৩৩ বৎসর পরেও আমি সেই দিনের দৃশ্য অবিকল দেখিতে পাইতেছি। দেখিতেছি—একদল ফকির; সকলেরই গৈরিক আলখাল্লা পরা; কাহারও মুখে কৃত্রিম দাড়ী, কাহারও মাথায় কৃত্রিম বাব্‌রী চুল, সকলেই নগ্নপদ। সম্মুখভাগে প্রফুল্লচন্দ্র, তাঁহার বাম পার্শ্বে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বানবারীলাল, দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ। প্রফুল্লচন্দ্র কৃত্রিম দাড়ী বা চুল পরিধান করিত না। সে গৌরকায় পুরুষ ছিল; তাহার মুখে দাড়ী ছিল। আমি এখনও দেখিতে পাইতেছি, তিন ভাইয়ের হস্তে তিনখানি খঞ্জনী। সেই তিনখানি খঞ্জনীতে এক সঙ্গে ঘা পড়িতেছে, আর তিন ভাই প্রেমে মত্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নাচিতেছে, আর গাহিতেছে—

"ভাবী দিন কি ভয়ঙ্কর—"

বলিতে কি, সে সময়ে আমাদের অঞ্চলের লোকে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কে জানিত যে, আমাদেব অবসর সময়ের খেয়াল হইতে যে সামান্য গানটী বাহির হইয়াছিল, তাহার তেজ এত অধিক! কে জানিত যে, এই কাঙ্গাল ফিকির চাঁদের সঙ্গীতে সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ, মধ্যবঙ্গ, উত্তর বঙ্গ এবং আসাম প্রদেশ ভাসিয়া যাইবে! কে জানিত যে সামান্য

বীজ হইতে এমন প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মিবে ! প্রিয়তম অক্ষয়কুমার সত্য সত্যই বলিয়াছেন যে, "এমন যে হইবে, তাহা ভাবি নাই ! এমন করিয়া যে দেশের জনসাধারণের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করা যায়, আমি জানিতাম না।"

প্রফুল্লচন্দ্রের গান বেশ হইয়াছে শুনিয়া সকলেরই মনে সাহসের সঞ্চার হইল। তখন প্রফুল্লচন্দ্র পরম উৎসাহে আর একটী গান রচনা করিল এবং 'ফিকিরচাঁদ' ভণিতা ব্যবহার করিল। সে গানটীও আমি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। গানটী এই—

"দেখ্ দেখি ভেবে ভেবে, কেবা রবে, যে দিন সে তলব দিবে।
১। কোথা তোর রবে বাড়ী, টাকাকড়ি জুড়ী-গাড়ী কে হাঁকাবে ;
বল্ দেখি চেন ঝুলান ঘড়ী তোমার সেই দিনেতে কে পরিবে !
২। কোথা তোর রবে মালা, কৌপীন-ঝোলা, যে দিনে তোমায় বাঁধিবে ;
তার কাছে ছাপাবার যো নাই রে যাদু, ছাপা দিয়ে কে ছাপাবে !
৩। ফিকিরচাঁদ ফকিরে কয়, তা' হবার নয়, ঘুস দিয়ে কাজ হাসিল হবে !
বিপদে তর্‌বি যদি, নিরবধি, সেবিগে চল্ সত্য দেবে (ও ভোলা মন) "

এখানে একটী কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে। উপরিলিখিত গানটিতে তথাকথিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর একটু ইঙ্গিত আছে বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন ; তিনি, যিনি এই গানের রচয়িতা, তিনি সত্য সত্যই কাহারও উপরে কটাক্ষ করেন নাই। আমাদের গ্রামটী বৈষ্ণবপ্রধান গ্রাম। গ্রামে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের সংখ্যা বেশী নহে ; তিলি এবং তন্তুবায়গণের সংখ্যাই অধিক। কাঙ্গাল হরিনাথ তিলিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের গ্রামে তিলিজাতিই বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ; তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। তাঁতি, কুমার, কামার ও অন্যান্য সকলেই বৈষ্ণব। সুতরাং আমাদের গ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল এবং এখনও আছে। এ অবস্থায় ধর্ম্মের

সম্বন্ধে কথা বলিতে হইলে স্বতঃই কদাচারী বৈষ্ণবগণের কথাই মনে উঠিয়া থাকে, সুতরাং ইহা ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের উপর আক্রমণ বলিয়া আমরা স্বীকার করি নাই এবং এখনও করি না ; প্রফুল্লচন্দ্রও তখন এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

এইরূপ একটু প্রতিবাদ হইয়াছে শুনিয়া কাঙ্গাল হরিনাথ দুইটী গান দিলেন। এই দুইটী গান বড়ই সুন্দর। আমি নিম্নে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। প্রথম গানটী এই—

"বল কে চিনিবে আর, মন রে তোমার, মনের মাঝে রোগের হাঁড়ী।
চিনিবে কার সাধ্য, ডাক্তার-বৈদ্য হদ্দ হ'ল টিপে নাড়ী।
১। তুমি যে সাধুর গান গাও, জগৎ মাতাও, উপদেশ দাও নেড়ে দাড়ি ;
তোমার যে আপন বেলায় মহাপ্রসাদ, পরের বেলায় ভাতের কাঁড়ি।
২। তুমি এ রোগের জ্বালায় জ্বলছ সদাই, দেখে লোকের টাকাকড়ি ;
তোর এ জ্বরবিকারে বৈদ্য ঘোরে, ভেবে মরে কি দেবে বড়ি।
৩। কাঙ্গাল কয় হও রে দৃঢ়, ছাড়, ছাড় কুপথ্য, মিথ্যা-ছল-চাতুরী ,
এ রোগের জ্বালা যাবে, প্রাণ জুড়াবে, খাও রে হরিনামের বড়ি।"

দ্বিতীয় গানটী এই—

"মজে তুই হরিনামে, মাতি প্রেমে, কেন না মন সং সাজিলি !
১। মন রে সংসারে এসে, হেসে হেসে, আগে কেশে কালী দিলি ;
ওরে মন বয়স-দোষে, রসে রসে, অবশেষে চূণ মাখিলি !
২। হরিনামে সাজ্‌লে রে সং, ফিরত না ঢং, থাক্‌ত এক রং চিরকালই ;
এখন তোর, কতক রাঙ্গা, কতক পাঙ্গা, ঠিক যে মাছরাঙ্গা হ'লি।
৩। যাবি তুই লেংঠা হ'য়ে লজ্জা খেয়ে, লেংঠা হয়ে যেমন এলি ;
ওরে তোর কৌপীন-কোঁচা, জামা মোজা, ঘোলে গোঁজা হয় সকলই।
৪। কাঙ্গাল কয়, প্রেমভরে, সং সাজরে, গান কর রে বাহু তুলি ;
যাদের নাই হরি-ভজন, সত্য-কথন, তারাই রে সং হয় কেবলই।"

ফিকিরচাঁদের গান সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহার তৎসময়ের

জলধর সেনের আত্মজীবনী
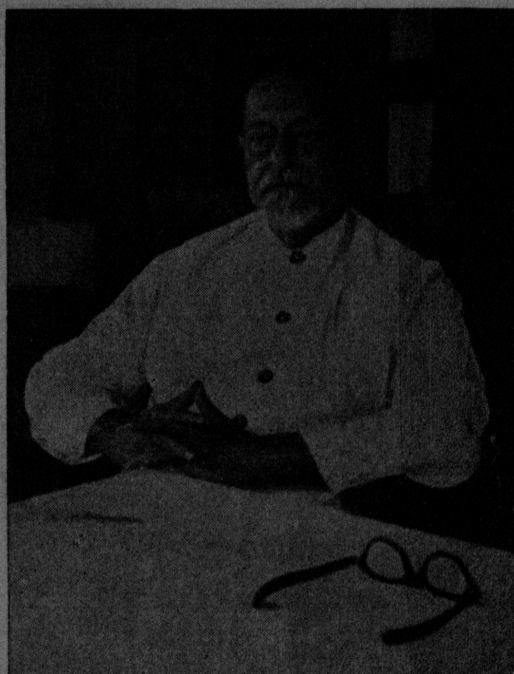
সাংবাদিক-প্রবর

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

দিনলিপিতে যে কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা আমি এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কাঙ্গাল লিখিতেছেন—

"শ্রীমান্ অক্ষয় ও শ্রীমান্ প্রফুল্লের গানগুলির মধ্যে আমি যে মাধুর্য্য পাইলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, এভাবে সত্য, জ্ঞান ও প্রেম-সাধনার তত্ত্ব প্রচার করিলে, পৃথিবীর কিঞ্চিৎ সেবা হইতে পারে অতএব কতিপয় গান রচনা দ্বারা তাহার স্রোত সত্য, জ্ঞান ও প্রেম-সাধনের উপায়স্বরূপ পরমাত্ম পথে ফিরাইয়া আনিলাম এবং ফিকিরচাঁদের আগে 'কাঙ্গাল' নাম দিয়া দলের নাম 'কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ' রাখিয়া তদনুসারেই গীতাবলীর নাম করিলাম। কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের দলস্থ গায়কেরা বাউল সম্প্রদায়ের ন্যায় বেশ ও পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হৃদয় যতই পবিত্র হইতে লাগিল, ততই সত্য, জ্ঞান ও প্রেমময় গীতিসকল উদ্ভাসিত হইয়া হৃদয়ক্ষেত্র সত্য, জ্ঞান ও প্রেমানন্দে পূর্ণ করিতে লাগিল। দলস্থ যাঁহারা যতদূর পবিত্রতা রক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ কৃত বিষয়ে ততদূর এক আশ্চর্য্য শক্তি লাভ করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের গান নিম্ন শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীর লোকের আনন্দকর হইয়া উঠিল। মাঠের চাষা, ঘাটের নেয়ে, পথের মুটে, বাজারের দোকানদার এবং তাহার উপর-শ্রেণী সকলেই প্রার্থনাসহকারে ডাকিয়া কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের গান শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু নানা কারণে দেশস্থ কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন এবং নানা প্রকারে হৃদয়ে বেদনা প্রদান করিতে লাগিলেন। আমি একাকী সকল আঘাত সহ্য করিতে লাগিলাম। তিলার্দ্ধ মাত্রও অবসর নাই। সংসারধর্ম্ম ও সংসারধর্ম্মের অতীত পরমার্থ পর্য্যন্ত যিনি যে কোন কার্য্য না করুন, জগৎ তাহার প্রতিবাদ করিবে। প্রতিবাদ আছে বলিয়া এ জগতে এখনও

কিছু দৃঢ়তা, পবিত্রতা রহিয়াছে, অন্যথা ইহাও থাকিত না। কৃতকার্য্যে যতই প্রতিবাদ হইতে থাকে, কার্য্যে ততই স্বতঃ দৃঢ়তা জন্মে। যিনি ফিকির করিয়া হাপরে স্বর্ণ দগ্ধ করিয়া খাঁটি করিবার জন্য এইরূপ দগ্ধ করিতেছেন, বিরলে কেবল তাঁহার উদ্দেশ্যে ক্রন্দন করিয়া চক্ষের জলে বক্ষদেশ ভাসাইতে লাগিলাম।"

"আমি যে সময়ে এই অসহ্য যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হইতেছি, সেই সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ভক্তচূড়ামণি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া কুমারখালিতে আসিয়া কাঙ্গালের কুটীরে সপরিবারে অবস্থান করিলেন। আমি তাঁহাকে না বলিলেও, তিনি নিজ প্রভাবেই আমার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক এইভাবে উপদেশ প্রদান করিলেন যে, সর্ব্বপ্রকার উত্তাপ সহ্য করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ ও পরিষ্কার কর। অমৃত ফল ফলিবে।"

"এই সময় একদিন আমার জ্বর বোধ হওয়ায় কুশাসনে শয়ন করিয়া আছি। ইহা ত শারীরিক কোন প্রকার জ্বর নহে, ইহা মর্ম্মাঘাত ও চিন্তাজ্বর, অনলদগ্ধের মত দগ্ধ করিতেছে। সুতরাং নিদ্রা নাই। কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত এবং নিদ্রায় অভিভূত। স্কন্ধদেশ হইতে চরণ পর্য্যন্ত অব্যক্ত মহাদেবী জগন্মাতার একখানি অভূতপূর্ব্ব মুখ আমার মুখের উপরে প্রকাশিত হইল। শরীর চমকিত হইয়া উঠিল। এ কি ব্যাপার! চক্ষুর জলে দগ্ধ হৃদয় শীতল হইতে লাগিল। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। যিনি আমার মুখের উপর মুখ প্রকাশ করিয়া সান্ত্বনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এ সকল তাঁহারই খেলা। তিনি অব্যক্ত হইয়াও, যে তাহার নিকট ব্যক্ত হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা করেন। তখন আমার এই বিশ্বাস এত বলবতী হইয়া উঠিল যে, আমি যে রূপ দেখিয়াছিলাম, সেই চিন্ময় রূপ দেখিবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইলাম; এবং এক্ষণে

সংসারে সকল প্রকারের জ্বালাযন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত প্রতিদিন বিরলে বসিয়া তাঁহার নিকটেই কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম। আমি কি ছিলাম, কে আমাকে এরূপ করিল? সংশোধন করিয়া আমার হৃদয়ফলক এমন নির্ম্মল করিল যে তাহা অব্যক্তের স্বরূপশক্তি প্রকাশের মত করিয়া তুলিল।"

সেই দিনের অবস্থা স্মরণ করিয়া কাঙ্গাল যে গানটী লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। গানটী এই :

"অপরূপের রূপের ফাঁদে, প'ড়ে কাঁদে প্রাণ যে আমার দিবানিশি।
১। কাঁদ্‌লে নির্জ্জনে বসে, আপনি এসে দেখা দেয় সে রূপরাশি ;
সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অনুরূপ শত শত সূর্য্য শশী।
২। যদি রে চাই আকাশে, মেঘের পাশে সে-রূপ আবার বেড়ায় ভাসি ;
আবার রে তারায় তারায় ঘুরে বেড়ায়; ঝলক লাগে হৃদে আসি।
৩। হৃদয় প্রাণ ভ'রে দেখি, বেঁধে রাখি, চিরদিন এই রূপশশী ;
ওরে, তায় থেকে থেকে ফেলে ঢেকে কু-বাসনা মেঘ রাশি।
৪। কাঙ্গাল কয়, যে জন মোরে দয়া ক'রে দেখা দেয় রে ভালবাসি ;
আমি যে সংসার-মায়ায় ভুলিয়ে, তাঁয় প্রাণভ'রে কৈ ভালবাসি।"

ফিকিরচাঁদের গান আর আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামে আবদ্ধ থাকিতে পারিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এই গান শুনিবার জন্য চার পাঁচ ক্রোশ হইতে অনেক লোক আসিতে আরম্ভ করিল। এদিকে রেল-পথেও বহুদূর হইতে অনেক লোক আসিতে লাগিল। সকলেরই অনুরোধ তাঁহাদের গ্রামে একবার ফিকিরচাঁদের দলের পদার্পণ করিতে হইবে।

শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার কয়েক দিন বাড়ীতে থাকিয়াই রাজসাহী চলিয়া গেলেন। আমি তখন গোয়ালন্দে স্কুলমাষ্টারী করি। আমিও কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলাম। কিন্তু ফিকিরচাঁদের এমন আকর্ষণ যে, প্রতি শনিবারের

রাত্রিতে বাড়ী যাইতাম এবং যে একদিন থাকিতাম, সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া নূতন নূতন গান শুনিতাম। আমরা তখন বাহিরে পড়িয়া গেলাম। ফিকিরচাঁদের গানের দলের ব্যবস্থার ভার কাঙ্গালের উপরই পড়িল।

চারিদিক হইতে যখন নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল, তখন কাঙ্গাল এই নিয়ম করিয়া দিলেন যে, ফিকিরচাঁদের দল গ্রামেই হউক বা বিদেশেই হউক, যেখানেই যাইবেন, সেখানে কাহারও গৃহে অতিথি হইতে পারিবেন না, সামান্য এক ছিলিম তামাকও বাড়ী হইতে লইয়া যাইতে হইবে। তবে দলের লোকদিগের গৃহে গেলে এ নিয়ম খাটিবে না। পাছে ইহা একটা ব্যবসায়ে পরিণত হয়, এই আশঙ্কা করিয়াই কাঙ্গাল এই নিয়ম করিয়া দিলেন।

এই সময় একদিন পরলোকগত মীর মশারফ হোসেন মহাশয় কুমারখালীতে আসিলেন। তিনি কাঙ্গালের সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন। মীর সাহেবের বাড়ী কুমারখালীর অদূরবর্ত্তী গৌরনদীর তটে লাহিনীপাড়া গ্রামে। জাতিতে মুসলমান হইলেও তিনি বাঙ্গালাভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া ভক্তি করিতেন। কাঙ্গাল হরিনাথ মীর মশারফ হোসেনকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং বাঙ্গালা লেখা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন। এই উৎসাহের ফলেই মীর সাহেব বাঙ্গালাসাহিত্যের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক হইয়াছিলেন। তাঁহার 'বিষাদ-সিন্ধু' তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। মীর মশারফ কাঙ্গালের প্রকাশিত "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" পত্রিকার লেখক ছিলেন। আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন প্রতি সপ্তাহে মীর সাহেবের লেখা পড়িবার জন্য যে কত আগ্রহ হইত তাহা বলিতে পারি না। তিনি প্রবন্ধের নিম্নে নিজের নাম দিতেন না—লিখিতেন "গৌরতটবাসী মশা"। এই মশার লিখিত গদ্য-পদ্য সন্দর্ভ পাঠ করিয়া আমরা যে কত উপকৃত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি

না। তাঁহার "গৌরী-সেতু", তাঁহার "উদাসীন পথিকের মনের কথা", তাঁহার "গাজী মিয়ার বস্তানী", আর তাঁহার অমূল্য রত্ন "বিষাদ-সিন্ধু" যে আমরা কতবার পড়িয়াছি তাহার সংখ্যা করা যায় না। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্ত কত পরিশ্রম করিয়াছেন। আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাকে নীল-বিদ্রোহ সম্বন্ধে অনেক 'নোট' দিয়া যাইব, তুমি একখানি ইতিহাস লিখিও।" আমি এ বয়সে আর পারিলাম না। আলস্যবশতঃ সে 'নোট' আর লওয়া হইল না। তিনিও আমাকে ফাঁকি দিয়া দুই বৎসর হইল সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। এতদিনের মধ্যে এমন একজন সাহিত্যসেবকের নাম কেহই করেন নাই। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে চুঁচুড়ায় পঞ্চম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় মীর মশারফ হোসেনের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়াছিলেন।

যাক্ সে কথা। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে একদিন মীর মশারফ হোসেন কুমারখালীতে কাঙ্গালের কুটীরে উপস্থিত হইলেন এবং ফিকিরচাঁদের দলকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কাঙ্গাল সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, "দলের নিয়মানুসারে দলের লোকেরা তোমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না। তোমার বাড়ীতে গান শেষ করিয়া দলের লোকেরা সেই রাত্রেই বাড়ী ফিরিয়া আসিবেন, তোমার বাড়ীতে তাঁহারা এক ছিলিম তামাকও খাইবেন না। মশারফ বলিলেন, "সে কি রকম কথা? তা কি হয়?" কাঙ্গাল বলিলেন, "তবে তুমি যদি এই দলভুক্ত হও তবে তাঁহারা তোমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারিবে।" মশারফ হাসিয়া বলিলেন, "আমি ত গান করিতে জানি না"। কাঙ্গাল উত্তর করিলেন,

"গান করিতে জান না বটে, কিন্তু গান ত লিখিতে জান।" মীর মশারফ বলিলেন, "তাহা হইলে আমি দলভুক্ত হইলাম। এখনই গান লিখিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি তখনই গান লিখিতে বসিলেন। আমরা সেই গানটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম; মীর সাহেব এই দলের জন্ম আর কোন গান পরে দেন নাই। গানটী এই:

"রবে না চিরদিন সুদিন কুদিন, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে!
১। এই যে আমার আমার সব ফক্কিকার, কেবল তোমার নামটী রবে।
হবে সব লীলা সাঙ্গ, সোনার অঙ্গ ধূলায় গড়াগড়ি যাবে।
২। সংসারের মিছে বাজী, ভোজের বাজী, সব কারসাজি ফুরাইবে,
তখন রে এক পলকে, তিন ঝলকে সকল আশা ঘুচে যাবে।
৩। তোমার এই আত্মজন, ভাই পরিজন, হায় হায ক'রে কাঁদবে সবে,
তারা ত পেয়ে ব্যথা, ভাঙ্গবে মাথা তুমি কথা না কহিবে।
৪। তোমার সব টাকাকড়ি, ঘরবাড়ী, ঘুড়িগাড়ী পড়ে রবে;
আবার রে পা থাকিতে, হাত রহিতে পরের কাঁদে যেতে হবে।
৫। আগে রে ক'রে হেলা, গেল বেলা সন্ধ্যাবেলা আর কি হবে,
জগতের কার যিনি, দয়ার খনি, তিনি 'মশা'র ভরসা ভবে।"

তাহার পরই একদিন ফিকিরচাঁদের দল মীর সাহেবর লাহিনীপাড়ার বাড়ীতে যাইয়া গান করিয়া আসিলেন। আমাদের গ্রামের নিকটবর্ত্তী এমন গ্রাম অতি অল্পই ছিল, যেখানে ফিকিরচাঁদের দলকে গান করিবার জন্ম যাইতে হয় নাই।

*

* *

[জলধরদাদা তাঁহার আত্মজীবনী এই পর্য্যন্ত বলিয়া থামিয়া যান। তখন আমায় বলিয়াছিলেন,—'আমার শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সব কথাই তোমায় বল্লুম; এ আর অন্য কেউ বলতে পারবে না। আমার কলকাতায় আসা থেকে পরবর্ত্তী জীবনের কথা হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সব জানে। তাঁর কাছ থেকেই তুমি সে-সব খবর যোগাড় করতে পারবে।—লিপিকার]

পরিশিষ্ট

স্বর্গত জলধর সেনের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা

১২৬৬ বঙ্গাব্দের (ইং ১৮৬০) ১লা চৈত্র কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী কুমারখালি গ্রামে কায়স্থ-পরিবারে জলধর জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের তিন বৎসর পরে পিতা হলধরের মৃত্যু ঘটে। এই সময় জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বয়স ৫ বৎসর ও অনুজ শশধরের বয়স ৬ মাস মাত্র। প্রথমে জ্যেষ্ঠতাত ও পরে তদীয় পুত্র ইঁহাদের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। ইঁহাদের বাল্যজীবন অতিশয় দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়।

পাঠারম্ভ—কুমারখালির বাংলা স্কুলে, কাঙ্গাল হরিনাথের নিকট। ১৮৭৫ খ্রীঃ গোয়ালন্দ মাইনর স্কুল হইতে মাইনর পাশ ও ৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ। এই বৎসরেই ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাওয়ায় একটী রৌপ্যপদক প্রাপ্তি। ১৮৭৮ খ্রীঃ কুমারখালি ইংরেজী স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ ও ১০৲ টাকা বৃত্তি লাভ। ১৮৮০ খ্রীঃ জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশন হইতে এফ. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন, কিন্তু প্রবল জ্বরে পরীক্ষায় অনুপস্থিত হওয়ায় অকৃতকার্য হন।

অর্থাভাবের দরুণ অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া তরুণাবস্থায় গোয়ালন্দ ইংরেজী স্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের চাকুরী গ্রহণ। ছয়-সাত বৎসর এই চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন। এই চাকুরী করিবার সময় ১৮৮৩ খ্রীঃ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের প্রপৌত্রীর সহিত বিবাহ। ১৮৮৫ খ্রীঃ (বৈশাখ ১২৯৩) পত্নীবিয়োগ, অতঃপর এক মাস পরেই মাতৃবিয়োগ।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা শশধর বি. এ. পাশ করিয়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলে চাকুরী

পাইলে শোকবিহ্বল জলধর নিজেকে বন্ধনমুক্ত মনে করিয়া ১২৯৬ বঙ্গাব্দের গোড়ার দিকে (১৮৮৮ খ্রীঃ) প্রবাসযাত্রা করেন। প্রথমে ডেরাডুনে গিয়া শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৮৯০ খ্রীঃ ৫ই মে হিমালয়যাত্রা শুরু হয়। বৈরাগীর বেশে নানা তীর্থ ও দুর্গম স্থান পর্যটনে বহু দিন কাটাইয়া দেন।

১৮৯৩ খ্রীঃ হিমালয় হইতে প্রত্যাগমন এবং মহিষাদল-রাজ-স্কুলের ও মহারাজকুমারদ্বয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। মহিষাদলে ১৮৯৪ খ্রীঃ ডায়মণ্ডহারবারের রায় বাহাদুর গিরীশচন্দ্র দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ ইহাঁদের প্রথম পুত্র অজয়ের জন্ম হয়। মহিষাদলে ৫ বৎসর কাটাইয়া কলিকাতায় আগমন এবং সংবাদপত্র ও সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ।

অল্প বয়স হইতেই বাঙলা সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কাঙ্গাল হরিনাথের প্রতিষ্ঠিত 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' নামক সংবাদপত্রে ইঁহার সাহিত্যচর্চ্চার হাতে-খড়ি। মাত্র পনের বৎসর বয়সে ইনি 'দুঃখিনী' নামক উপন্যাস রচনা করেন। ইহাই জলধর-রচিত প্রথম পুস্তক।

'গ্রামবার্ত্তা' ও 'সোমপ্রকাশে' নিয়মিত ইনি লিখিতেন। গোয়ালন্দে শিক্ষকতা কার্যে রত থাকিবার সময় কাঙ্গাল হরিনাথ অসুস্থ হইয়া পড়ায় এক বৎসরকাল গ্রামবার্ত্তার সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। মহিষাদলে শিক্ষকতা করিবার সময় হিমালয়-ভ্রমণবৃত্তান্ত 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। সেই সময় সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকায়ও ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং ছোট গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন।

সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের পরামর্শানুযায়ী মহিষাদলের চাকুরী ছাড়িয়া আসিয়া 'বঙ্গবাসীর' সহকারী

সম্পাদক হন এবং ছয় মাস কার্য করেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ 'বসুমতী'র সহকারী সম্পাদকের কার্য গ্রহণ করিবার অল্পকাল পরেই ঐ পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন (১৮৯৯)। সুদীর্ঘকাল ইনি 'বসুমতী'র সম্পাদক ছিলেন। পরে, কাব্যবিশারদের মৃত্যু হইলে 'হিতবাদী'র সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য গ্রহণ করেন এবং কিছুকাল পরে উক্ত পত্রের সম্পাদক হন (১৯০৮ জানুয়ারী)। দুই বৎসর পরে 'হিতবাদী'র সম্পাদকতা ছাড়িয়া দিয়া সন্তোষের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ও কবি প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর পুত্রকন্যাদের গৃহশিক্ষকরূপে তাঁহাদের দেশে গমন করেন। শেষে ঐ জমিদার ষ্টেটের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ২ বৎসর সেখানে কাটাইয়া ম্যালেরিয়ায় বিশেষভাবে পীড়িত হইয়া পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং গভর্ণমেণ্ট-প্রকাশিত 'সুলভ সমাচার' পত্রের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিন মাস পরে উক্ত পত্রের সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যু হইলে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন (১৯১১)।

১৩২০ বঙ্গাব্দে 'ভারতবর্ষের'র সম্পাদক হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উহার সম্পাদক ছিলেন।

ভ্রমন-বৃত্তান্ত, উপন্যাস, ছোট গল্প ইত্যাদিতে ইঁহার রচিত পুস্তকের সংখ্যা ৬০ খানিরও অধিক। তন্মধ্যে প্রবাসচিত্র, হিমালয়, নৈবেদ্য, দুঃখিনী, বিশুদাদা, অভাগিনী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কয়েক-খানি শিশুপাঠ্য এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকও রচনা করিয়াছেন। অর্ধশতাব্দী কাল ধরিয়া বিভিন্ন পত্রিকায় ইঁহার অসংখ্য লেখা বাহির হইয়াছে।

১৩২৯-১৩৩০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে ১৩৩১ বঙ্গাব্দে এবং

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের ইন্দোর অধিবেশনে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে সাহিত্য-শাখার সভাপতি হন।

বহু সাহিত্য-সভার সহিত ইঁহার বিশেষ সংশ্রব ছিল। 'রবি-বাসরে'র ইনি সর্বাধ্যক্ষ এবং প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ১৩২৩ হইতে ১৩৪১ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত হাওড়ার গোবর্ধন-সাহিত্য ও সঙ্গীত-সমাজের সভাপতিত্ব করেন।

বহু প্রতিষ্ঠান হইতে জলধরসেনকে সংবর্ধিত করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের, ১২ই ভাদ্র রবিবার, 'রবি-বাসর'-কর্তৃক সংবর্ধনা এবং ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২রা হইতে ৫ঠা ভাদ্র নিখিল-বঙ্গ-জলধর সংবর্দ্ধনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজ-সরকার হইতে ইনি ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'রায় বাহাদুর' উপাধি পান। দেশবাসীর নিকট হইতে ইনি যে 'দাদা' উপাধি লাভ করেন, সেই গৌরবময় উপাধিলাভ আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ৮ই মাঘ দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং অল্পকাল পরেই ৭৯ বৎসর বয়সে ২৬শে চৈত্র রবিবার বেলা তিন ঘটিকার সময় কলিকাতা বাগবাজারস্থ বাসাবাটীতে ইনি পরলোকগমন করেন।

জলধরবাবু সাত পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র অজয়কুমার শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতাকে বিবাহ করিয়াছেন। আরও তিনটী পুত্রও বিবাহিত। কন্যা সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। *

* ('রবি-বাসরে'র প্রথম বার্ষিক জলধর স্মৃতি-তর্পণ সভায়
(২৫শে চৈত্র, ১৩৪৬) বিতরিত।)

জলধর-সংবর্দ্ধনা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক 'দাদা' রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুরের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে যশস্বী কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে সমগ্র দেশবাসী তাঁহাকে বিপুলভাবে সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "আশুতোষ হলে" বিগত ২রা ভাদ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরহিত্যে সংবর্দ্ধনা-সভার প্রথম অধিবেশন হয়। বঙ্গের বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিনিধিগণ সংবর্দ্ধনায় যোগদান করেন। দেশবাসীর পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে একটী সুন্দর অভিনন্দন পাঠ করেন। বাঙ্গালা দেশের মহিলাগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসুও একটী অভিনন্দন পাঠ করিয়াছিলেন। অনন্তর সভায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষায় ও ইংরাজীতে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ তাঁহাকে উপহার দেওয়া হয়। রবি-বাসর, ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘ, বঙ্গীয় সাহিত্য ও সঙ্গীত সঙ্ঘ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিভিন্ন শাখাসমূহ, প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন, সাহিত্য-সেবক সমিতি, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা এবং আরও বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে নানা অভিনন্দন প্রদত্ত হয়। অভিনন্দনপত্রগুলি ও তাহাদের আধারসমূহ নানাবিধ শিল্প-পরিকল্পনার দ্বারা সুদৃশ্য করা হইয়াছিল।

সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন : "চিরদিন দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া যাঁহারা শুধু সেবার আনন্দের জন্যই বঙ্গভারতীর সেবা করেন, প্রফুল্লহৃদয়ে দুঃখ-কষ্টকে বরণ করিয়া লয়েন তাঁহারা যে বাঙ্গালীর কত শ্রদ্ধার পাত্র, কত গৌরবের পাত্র, তাহা ভাষায় বর্ণনা করার যোগ্যতা আমার নাই। রায় বাহাদুর জলধর সেন আমাদের সেই আদরের, সেই গৌরবের বস্তু ; তাঁহাকে আমি অন্তরের অভিবাদন জানাইতেছি।"

"তাঁহার অর্দ্ধশত বৎসরের সাধনা বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল পৃষ্ঠায় সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকিবে। "সোমপ্রকাশ" "গ্রামবার্ত্তা", তথা "হিতবাদী", "বসুমতী" ও "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি পত্রিকা তাঁহার যৌবন ও পরিণত বয়সে অক্লান্ত সেবার প্রকৃষ্ট নিদর্শন চিরদিন ধারণ করিয়া রহিবে। তাঁহার সরস ও সুখপাঠ্য উপন্যাসগুলি, বিশেষতঃ তাঁহার "হিমালয় ভ্রমণ"—সহজ ও প্রাণস্পর্শী রচনাশক্তির পরিচয় বহন করিয়া বাঙ্গলার ঘরে ঘরে চির-আদৃত থাকিবে। তাঁহার ভাষা, তাঁহার বর্ণনার প্রাঞ্জলতা, বিশেষত তাঁহার লিখিবার নিজস্ব ভঙ্গি—বাঙ্গলার নরনারী-সমাজে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।"

"আজ এই আনন্দ-যজ্ঞে আপনাদের উপস্থিতিতে সত্যই আমি আনন্দে অভিভূত ও আশায় উৎফুল্ল হইয়াছি। আমার আনন্দ—আমাদের বাঙ্গলা ভাষা একদিন বিশ্ব জয় করিবে,—করিবেই করিবে!"

প্রতিভাষণে জলধর দাদা তাঁহার নিবেদন প্রসঙ্গে বলেন :—"আমার ভাই ভগিনীগণ! আপনাদের এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ সেবকের যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার, অভিবাদন ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন। আপনাদের আশীর্ব্বাদ যে ভাবে আমার শিরে বর্ষিত হইল, তার জন্য আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।"

"আমার এই সুদীর্ঘ জীবনকালে আপনাদের নিকট হইতে আমি যে আশাতীত, কল্পনাতীত অনুগ্রহ, স্নেহ, ভালবাসা পাইয়াছি, আপনারা যে আমাকে আপনাদের "দাদা" পদবীতে উন্নীত করিয়াছেন, বাংলা দেশে বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের মধ্যে আমি বাপের দাদা, ছেলের দাদা, পৌত্রের দাদা, জ্যেষ্ঠের দাদা, কনিষ্ঠের দাদা, জলধর রায় বাহাদুর নয়, জলধর সাহিত্যিক নয়, জলধর সম্পাদক নয়, জলধর সংবাদ-লেখক নয়, জলধর পুস্তক-লেখক নয়, জলধর সেন বাঙ্গালীর "দাদা"। এমন সৌভাগ্য কাহার হইয়াছে? আমি যে আপনাদের স্নেহ-ঋণে আকণ্ঠ নিমগ্ন।"

"আপনারা বলুন, আমাকে উপলক্ষ্য করে আপনারা বঙ্গবাণীকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। তাহা হইলে আমি যে বঙ্গবাণীর সেবায় আমার জীবনের ৭৫ বৎসর কাটাইয়াছি, তাঁহার চরণে আপনাদের এই সমস্ত অভিনন্দন-পত্র ও উপহার পৌছাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।"

দ্বিতীয় দিন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে হাওড়া শালিখা 'নাট্যপীঠে' সাহিত্য-সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে বহু সাহিত্যিক স্বরচিত প্রবন্ধাদি ও কবিতা পাঠ করেন এবং তৎপরে গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের সভ্যগণ কর্তৃক দক্ষতার সহিত "মহানিশার" অভিনয় হয়।

তৃতীয় দিন কলিকাতা এলবার্ট ইনিষ্টিটিউট হলে প্রীতি-সম্মিলন ও সঙ্গীতের জলসায় বিপুল জনসমাগম হয়। ঐ দিন রাজা শ্রীক্ষিতীন্দ্রদেব রায়মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করেন। স্যার শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ছিলেন প্রধান অতিথি। ভারতের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নায়কত্বে জলসা পরিচালিত হয়।

বহু সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদক যোগদান করিয়া এই জলসা সাফল্য-মণ্ডিত করেন।

জলসার পর জলধর দাদা তাঁহার এই বিপুল সংবর্দ্ধনার জন্য সংবর্দ্ধনা-সমিতিকে, উপস্থিত জন-মণ্ডলীকে এবং সমগ্র দেশবাসীকে তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। *

* ["কায়স্থ পত্রিকা" (আশ্বিন, ১৩৪১) হইতে উদ্ধৃত]

*

* *

জলধর সেন

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

"কাঙ্গাল" হরিনাথ মজুমদার তাঁহার প্রথম সময়ের শিষ্যত্রয়কে তিনরূপে বিঘোষিত করিয়াছেন :

তন্ত্রের রহস্যভেদনিপুণ শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব—দারিদ্র্যবরণকারী, সুতরাং "ফকির"; পরবর্ত্তীকালে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—উকীল, সুতরাং "ফিকির"; আর জলধর সেন পরিব্রাজক, সুতরাং "মুসাফীর"।

আমার সহিত জলধরবাবুর যখন প্রথম পরিচয়, তখন তিনি আর মুসাফীর নহেন; স্ত্রীকে হারাইয়া শ্মশানবৈরাগ্যবশে দেশে দেশে ঘুরিয়া আসিয়া আবার সংসারী হইয়াছেন—সংসারের প্রয়োজনে মহিষাদলে শিক্ষকের চাকরী লইয়াছেন। আমার সহিত তাঁহার পরিচয়ের সূত্র—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—পরিচয়ের কেন্দ্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের কথা। সেবার কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় রাজনীতিক সম্মেলন। সম্মেলন, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, কয় বৎসর বন্ধ ছিল এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে নূতনভাবে পুনর্জ্জীবিত হয়—তাহার অধিবেশন আর কলিকাতায় না হইয়া মফঃস্বলে সহরে সহরে হইতে থাকে। প্রথম অধিবেশন বহরমপুরে—বৈকুণ্ঠনাথ সেনের আহ্বানে, তাহার সভাপতি আনন্দমোহন বসু। দ্বিতীয় অধিবেশন কৃষ্ণনগরে। সেই অধিবেশনে অক্ষয়কুমারের সহিত আমাদের পরিচয়। এই "আমাদের"—গৌরবে

বহুবচন নহে ; তখনই সাহিত্যিকদিগের ভিন্ন ভিন্ন দল হইয়াছে—এক দলের সদস্য সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—'সাহিত্য' পত্রের সম্পাদক। আমি সেই দলে আকৃষ্ট হইয়াছি—আমার প্রথম প্রকাশিত পুস্তক "উচ্ছ্বাস" কবিতাসংগ্রহ সুরেশচন্দ্রের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছে এবং সুরেশচন্দ্রের চেষ্টায় কবি নবীনচন্দ্র সেন কবিতাগুলি সম্বন্ধে মত যে পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহাই ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কৃষ্ণনগরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোমোহন ঘোষ জনগণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন—প্রত্যেক প্রস্তাবে প্রস্তাবক ইংরেজীতে ও সমর্থক বা অনুমোদক বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিবেন। রাজসাহী হইতে আগত প্রতিনিধি অক্ষয়কুমারের বাঙ্গালা বক্তৃতা আমাদিগকে আকৃষ্ট করে। তাহাতেই পরিচয় হয়। পরিচয়কালে তিনি 'সাহিত্য' পত্রের অন্যতম লেখক হয়েন। অক্ষয়কুমারের ঐতিহাসিক খ্যাতি তখনও ব্যাপ্তিলাভ করে নাই এবং পরবর্ত্তীকালে বন্ধুবর শরৎকুমার রায়ের সহিত সম্মিলন-ফলে তিনি ঐতিহাসিক প্রতিভার অনুশীলনের যে সুযোগ লাভ করিয়া-ছিলেন, তাহাও তখন ঘটে নাই। কিন্তু তাঁহার রচনায় নূতন ঐতিহাসিকের বৈশিষ্ট্য পরিচয় ছিল।

তিনিই জলধর বাবুর সহিত আমাদের সাহিত্য-গোষ্ঠীর পরিচয় করাইয়া দেন। জলধর বাবুর দুই চারিটি ভ্রমণ বিবরণে যে সাহিত্যানু-রাগের পরিচয় ছিল, তাহা ছাত্র "ঠেঙ্গাইয়া" নষ্ট না হয় ইহাই অক্ষয়-কুমারের অভিপ্রেত ছিল এবং সেইজন্য তিনি একবার জলধর বাবুকে কলিকাতায় 'সাহিত্য' গোষ্ঠীতে আনয়ন করেন। সুরেশচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিয় দৌহিত্র ছিলেন—মাতামহের সামাজিক গুণ পাইয়া তাহার অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে সাহিত্যিক সম্মেলন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। নবীনচন্দ্র তাঁহার গৃহকে "মুক্তিমণ্ডপ" বলিয়া

অভিহিত করিতেন। সে গৃহে নবীনচন্দ্রের মত প্রবীন ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকও অতিথি হইতেন। রবীন্দ্রনাথও তথায় আসিতেন। আর যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, নিত্যকৃষ্ণ বসু, অক্ষয়কুমার বড়াল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি। সেই সাহিত্যতীর্থে অক্ষয়কুমার তাঁহার বন্ধু জলধরবাবুকে আনিলেন। আমরা জলধরবাবুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইলাম। তিনি যাহাতে কলিকাতায় আসিয়া সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, সেই চেষ্টা চলিতে লাগিল।

এই সময় একটি ঘটনায় অক্ষয়কুমারের সহিত 'সাহিত্য' গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইল। তিনি তখন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের প্ররোচনায় মহারাণী ভবানীর জীবনকথা ও সেই সময়ের বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতেছিলেন। কথা ছিল, মহারাজার ব্যয়ে পুস্তকখানি মুদ্রিত হইবে। "হাফটোন" ছবি তখন নূতন; এ দেশে তাহার ব্লকও হয় না, ব্লক ছাপিবার সুব্যবস্থাও হয় নাই। অক্ষয়কুমারের পুস্তকের জন্য "হাফটোন ব্লক" ইংলণ্ডে প্রস্তুত করান হয়; তথা হইতে তাহা ছাপাইয়া আনা হইবে। এইরূপ অবস্থায় "কাঙ্গাল" হরিনাথের মৃত্যু হইল এবং অক্ষয়কুমার তাঁহার সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিলেন, তাহা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইল (বৈশাখ, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ)। সেই প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল যে, 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা' নামক তাঁহার সপ্তাহিক পত্রে নির্ভীকভাবে লোকের ত্রুটির উল্লেখ করায় হরিনাথের বিরুদ্ধে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও পরগণার জমিদার উভয়েই "খড়্গহস্ত" হইয়া উঠেন। ১২৮৫ বঙ্গাব্দে হরিনাথ জমিদারের অত্যাচার সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারকে যে পত্র লিখিয়াছেন—তাহা বেদনার্ত্ত হৃদয়ের শোণিতে লিখিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহা উদ্ধৃত করিয়া অক্ষয়কুমার প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিয়াছিলেন :

"যে জমিদারের অত্যাচারে হরিনাথ এরূপ সকরুণ আর্ত্তনাদ করিয়া গিয়াছেন, কোনও স্থানে তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। আকারে ইঙ্গিতে যাহা জানাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে যাঁহাদিগের কৌতূহল দূর হইবে না, আমরা তাঁহাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অসমর্থ। হরিনাথ যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সুতীব্র সমালোচনায় রাজদ্বারে পল্লীচিত্র বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি এ দেশের সাহিত্য-সংসারে এবং ধর্ম্ম-জগতে চিরপরিচিত, তাঁহার নামোল্লেখ করিতে হৃদয় ব্যথিত হয়, লেখনী অবসন্ন হইয়া পড়ে।"

এই মন্তব্যে জমিদারের বংশধরগণ অক্ষয়কুমারের প্রতি রুষ্ট হইয়া উঠেন; কিন্তু মন্তব্যের প্রতিবাদ না করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করেন। তাঁহাদিগের সহিত মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহাদিগের অনুরোধে মহারাজা মহারাণী ভবানীর চরিত ছাপাইবার ভার ত্যাগ করিলেন। তাহাতে ঐ পুস্তক ক্রমশঃ 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়। হাফটোন ব্লক ছাপাইবার সুব্যবস্থা না থাকায় সেগুলির ছাপা ভালও হয় নাই।

'সাহিত্যের' যে সংখ্যায় অক্ষয়কুমারের পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতেই অক্ষয়কুমারে মীরজাফর সম্বন্ধীয় রচনার প্রথমাংশ ও জলধর বাবুর "গেঙ্গোত্রীর পথে" প্রবন্ধের একাংশ প্রকাশিত হয় এবং তাহাতে হরিনাথের উল্লেখ করা হয়।

জলধর বাবুকে কলিকাতায় আনিয়া সাহিত্য সাধনার সুযোগদানের যে চেষ্টা হইতেছিল, তাহা সফল হইল। প্রধানতঃ সুরেশচন্দ্রের চেষ্টায় তিনি 'বসুমতী' সপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে স্থানলাভ করিলেন। 'বসুমতীর' প্রবর্ত্তক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সুরেশচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন এবং তিনিই 'সাহিত্য' প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহা সম্পাদক সুরেশচন্দ্রকে প্রদান

করেন। উপেন্দ্রনাথ পরমহংস রামকৃষ্ণের শিষ্য ছিলেন। তিনি বহু লোককে তাঁহার প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করিতে পারিলেই যেন আনন্দলাভ করিতেন।

জলধরবাবু কলিকাতায় আসিলে সুরেশচন্দ্রের গৃহেই সাদরে গৃহীত হইলেন এবং দীর্ঘকাল—অর্থাৎ কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া করিয়া স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আনিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুরেশ বাবুর গৃহেই ছিলেন।

সেই সময় যে তাঁহার সহিত আমাদিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে তাহা বলাই বাহুল্য।

তখন জলধরবাবুর বহু ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়।

সেই সময় হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জলধর বাবুর সহিত আমার বন্ধুত্ব কখনও ক্ষুন্ন হয় নাই। এমন কি যখন তিনি জরাজনিত দৌর্ব্বল্যে কাতর—তাঁহার কথা "কাণে ত অনেকদিন থেকেই ভাল শুনি না এখন আবার চোখেও ভাল দেখিতে পাই না"—তখন তিনি 'ভারতবর্ষের' সম্পাদন-কার্য্যে সহকারী মনোনীত করিয়া দিবার ভার আমাকেই দিয়াছিলেন।

বলা প্রয়োজন, যে দীর্ঘকাল আমাদের এই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহার মধ্যে বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক দলের ভাঙ্গাগড়া হইয়াছিল এবং দলাদলির প্রভাব যে সাহিত্যে পতিত ও অনুভূত হয় নাই, তাহা নহে। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভক্তদিগের সহিত আমার ও 'সাহিত্য' গোষ্ঠীর বিবাদ, এবং সেই বিবাদের ফলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রদীপ' ত্যাগ ও 'প্রবাসী' প্রবর্ত্তন; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য্যালয় স্থানান্তরিত করায় বিবাদ ও ফলে ধনীর আনুকুল্যে "সাহিত্য সভা" প্রতিষ্ঠা; দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত রবীন্দ্রনাথের মতভেদ ও তদজনিত তিক্ততার উদ্ভব—এইরূপ নানা ঘটনা সেই সময়ের সাহিত্যক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয়—এ সকল

জলধরবাবুকে বিচলিত করিতে পারে নাই—ভিন্ন ভিন্ন—এমন কি বিবদমান—দলেও তাঁহার আদর ছিল—মতান্তর ও মনান্তর যেন তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি সাহিত্যিক মাত্রকেই ভালবাসিতেন ও আদর করিতেন; মনে করিতেন, সাহিত্য সকল দ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধে অবস্থিত।

'বসুমতীতে' কিছুদিন কাজ করিবার পরে তিনি অল্পদিনের জন্য 'বঙ্গবাসীতে' (সম্পাদকীয় বিভাগে) কাজ করেন। সে-ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতির চেষ্টায়।

কিন্তু জলধরবাবুকে সংবাদপত্রের কাজের জন্য তাঁহার বন্ধুরা কলিকাতায় আনেন নাই। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও বোধহয়, জলধরবাবুর ভ্রমণকাহিনীর কোন পুস্তক প্রকাশিত হয়, নাই; সুতরাং সেদিক হইতে তাঁহার কোন আযের উপায় ছিল না। আবার মাসিকপত্রের লেখকরা প্রায় কেহই পারিশ্রমিক চাহিতেন না। অর্থাৎ মাসিকপত্রের জন্য রচনা তখনও "সখের" ছিল। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন (তাঁহার আত্মচরিতের পাণ্ডুলিপিতে) যে, 'বঙ্গদর্শনের' লেখকগণ রচনাব জন্য পারিশ্রম চাহিতেন (অক্ষয়চন্দ্র সরকার সে জন্য "উপযুক্ত" পারিশ্রমিক দাবী করিয়াছিলেন), তথাপি অধিকাংশ লেখকই তখনও পারিশ্রমিক লইতেন না—সকলকে পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভবও হইত না। আমার যতদূর মনে পড়ে—জলধরবাবু যখন কলিকাতায় আসেন, তখন 'সাহিত্যের' লেখকদিগের মধ্যে মাত্র তিন জনকে পারিশ্রমিক দেওয়া হইত—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর ও দীনেন্দ্রকুমার রায়। সেই-জন্যই অর্থের প্রয়োজনে জলধবাবুকে সংবাদপত্রে কাজ করিতে হইয়াছিল। সে কাজ তাঁহার রুচিপ্রদ হয় হয় নাই—যে সকল গুণ

থাকিলে সংবাদপত্র সেবায় সাফল্য লাভ করা যায়, সে সকলেরও অনুশীলন তিনি কখন করেন নাই।

জলধরবাবুর পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পক্ষে সংবাদপত্র সেবা ত্যাগ করা সম্ভব হয়। তখন তিনি বাড়ী ভাড়া করিয়া সপরিবারে কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। পরিণত বয়সে তিনি কুমারখালীতে জমী লইয়া বাড়ী করিয়াছিলেন। তাহা সম্ভোগ করা তাঁহার ভাগ্যে হয় নাই। এখন কুমারখালী পাকিস্তানে।

প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশক হইয়া জলধরবাবুর সহিত তাঁহার হিতৈষী অভিভাবকের মত ব্যবহার করিতেন। একবার জলধরবাবু পুস্তক বিক্রয়ে তাঁহার প্রাপ্য আনিতে যাইলে—যখন তাঁহাকে হিসাব ও প্রাপ্য টাকা দেওয়া হইল, তখন গুরুদাসবাবু তাঁহার প্রিয় কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "অনন্ত, আন ত।" অনন্ত একগাছি স্বর্ণহার আনিলে গুরুদাসবাবু তাহা জলধরবাবুকে দিয়া বলিলেন, "এটি বৌমাকে দিবেন।" সেই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে জলধরবাবু কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। গুরুদাসবাবু মৃদুস্বভাব ছিলেন—জলধরবাবুকে বলিলেন, "সাবধানে নিয়ে যা'বেন—পথে যেন না হারান।"

গুরুদাসবাবুর দোকান হইতে জলধরবাবু যে টাকা পাইতেন তাহাতে তাঁহার সংসারযাত্রার ব্যয়-নির্ব্বাহ হইত। সংসারও বড় ছিল।

সেই সময় গুরুদাসবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিদাসবাবুর সহিত জলধরবাবুর যে পরিচয় হয়, তাহা ঘনিষ্ঠতায়—আত্মীয়তায় পরিণত হয়। শ্রদ্ধেয় বন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া হরিদাসবাবু 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্র প্রচারের আয়োজন করেন। তখন বঙ্গালা মাসিকপত্রের

মধ্যে 'ভারতী' নানা পরিবর্ত্তনের বা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া কোনরূপে অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে; সুরেশচন্দ্রের 'সাহিত্য'—রবীন্দ্রনাথের 'সাধনার' মত লুপ্ত হইয়া যায় নাই বটে, কিন্তু পূর্ব্বগৌরবহীন। 'প্রদীপে' আমার সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি কবিতা প্রকাশিত হইবার ব্যবস্থা হওয়ায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রদীপের' সম্পাদন-ভার ত্যাগ করিয়া 'প্রবাসী' প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। 'ভারতবর্ষকে' নূতন ভাবে—পূর্ণাঙ্গ ও উৎকৃষ্ট সাহিত্যপত্ররূপে প্রকাশ করাই দ্বিজেন্দ্রলালের ও হরিদাসবাবুর অভিপ্রেত ছিল। তাহার সব আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, তখন অতর্কিত ভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের লোকান্তর ঘটে। হরিদাসবাবু তখন 'ভারতবর্ষ' আদর্শানুরূপভাবে প্রকাশের জন্য সচেষ্ট হইলেন। একাধিক সম্পাদক পরিবর্ত্তনের পরে জলধরবাবুকেই সে ভার প্রদান করা হয়। মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত জলধরবাবু সেই ভার বহন করিয়া গিয়াছিলেন। 'ভারতবর্ষ' তাঁহার প্রিয় ও আশ্রয় ছিল। শারীরিক অক্ষমতাহেতু যখন তাঁহার পক্ষে একক সে ভার বহন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি।

জলধরবাবু ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, উপন্যাস, ছোট গল্প, নানা বিষয়ে প্রবন্ধ অনেক লিখিয়া গিয়াছেন। সে সকলের মধ্যে তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তই তাঁহাকে সাহিত্যজগতে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। বাঙ্গালায় যে বহু ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জলধরবাবু যখন সাহিত্যের সেই বিভাগে কাজ আরম্ভ করেন, তখন তাহা বিশেষ পরিচিত নহে। যৌবনে তিনি যে সকল স্থানে গিয়াছিলেন, সে সকল সম্বন্ধে তখনও অধিক বিবরণ লিখিত হয় নাই। বহুদিন তিনি সেই সকল কথা লইয়া রচনা করিয়াছেন।

মেকলে জন বানিয়ান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই জলধরবাবুর পরবর্ত্তী ভ্রমণ-বৃত্তান্তের কথায় মনে হয় :

"He continued to work the gold-fields he had discovercd, and to draw from it new treasures, not indeed with quite such ease and in quite such abundance as when the precious soil was still virgin, but yet with success which left all competition far behind."

জলধরবাবু যখন বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত তখন বহু প্রতিভাবান সাহিত্যিক খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্র বিদায় লইয়াছেন—অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ সাহিত্যিকরাও আর সোৎসাহে সাহিত্যসেবা করিতেছেন না। কিন্তু রবীন্দ্রাথ হইতে শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত যাঁহাদিগের কীর্ত্তি অক্ষয় তাঁহারা দিকপালের মত আসিয়াছেন। তাঁহাদিগের সকলেরই সহিত জলধরবাবুর ঘনিষ্ঠতা ছিল। শরৎচন্দ্র "দাদা"—জলধরকে অগ্রজের মতই ভালবাসিতেন। তিনি নবীন ও প্রবীণ উভয় লেখক-সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকাল সংযোগসেতু ছিলেন বলিলে অসঙ্গত হয় না। সেই সংযোগ-সাধন জন্ম 'রবিবাসর সাহিত্য প্রতিষ্ঠান' প্রতিষ্ঠিত হয়—তিনি তাহার সভাপতিই ছিলেন না—প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

জলধরবাবুর নিয়মানুগ ভাব ও সময় সম্বন্ধে লক্ষ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। ঠিক সময়ে তিনি প্রতিদিন 'ভারতবর্ষ' কার্য্যালয়ে আসিতেন—সব সভাতে, সমিতিতে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যাইতেন।

সমসাময়িক সাহিত্য-সমাজে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। তিনি তাঁহার অবিচলিত সাহিত্যানুরাগের ও সুমধুর ব্যবহারের জন্ম সে স্থান লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

আজ তাঁহার সমসাময়িক ও বন্ধুদিগের মধ্যে প্রায় সকলেরই তিরোভাব হইয়াছে। আজ তাঁহাদিগের ও তাঁহাদিগের সময়ের বাঙ্গালা সাহিত্য-সমাজের কথা স্মরণ করিলে আমার মনে হয়—

আমি যেন ভ্রমি একা রঙ্গমঞ্চপ'রে ;
নিবেছে আলোক তার,
শুকায়েছে ফুলহার ;
সঙ্গী যা'রা ছিল—গেছে কোন্ দূরান্তরে।

বাঙ্গালার সাহিত্য-সমাজে জলধরবাবু একটি স্বতন্ত্র আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। সে আদর্শ গাম্ভীর্য্যের সারল্যের প্রেমের ও নিষ্ঠার আদর্শ। সে আদর্শের প্রয়োজন আজ আমরা সাহিত্যিকরা বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছি।

*

* *

সমাপ্ত